The treatise presents an unprejudiced explanation of some of the latent powers within us and shows how their developement can augment our present senses. The purpose of the book is to acquaint the investigator with that vast and as yet only partially explored territory lying behind the objective world cognised by our five senses. Care has been taken to corraborate and verify the fact that by concentrating on solar plexus combined with "Kumbhak" psychil powers can be acquired such as (1) Clairvoyance, (2) Clairaudience, (3) Psychometry, (4) Telepathy.

In explaining the origin and capacities of the "Sixth-Sense" the aim of the author is to promote that knowledge which is to end pain,

Rai Saheb D, G. Chakravarty, 12, Haralal Mitter Street, Post Baghbazar, Calcutta. Price Re. 1-8-0. Pages 128.

অবতরণিকা।

যোগীরা বলেন, প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান ভৌতিক চক্ষু ছাড়া অন্য একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়, তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। সেই জন্যই যোগীরা তাহাকে যোগানুসন্ধান দ্বারা উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্য চক্ষুর দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থবিষ্ঠ বাহ্যবস্তু মাত্র দেখা যায়, সূক্ষ্ম বা কোন আভ্যন্তরিণ বস্তু দেখা যায় না। কিন্তু প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা, সূক্ষ্ম, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরিণ সমস্ত বস্তুই দেখা যায়, জ্ঞাত হওয়া যায়। সেই তৃতীয় চক্ষুর অন্য নাম দিব্য চক্ষু, আর্য্য বিজ্ঞান, জ্ঞানচক্ষু, সপ্তমেন্দ্রিয় ইত্যাদি। সেই চিত্তময় বা জ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষুর গোলক (আশ্রয়) ভ্রূ সন্ধির উপরিস্থ ললাট ভাগের অভ্যন্তর। ললাট অভ্যন্তরে তদ্বিধ তৃতীয় চক্ষু আছে। যাহার নাম পিনিয়াল গ্লাণ্ড ও পিটুটারী দেহ। তাহাদের সংযোগে তৃতীয় চক্ষু আবির্ভূত হইবে। ইহা জানাইবার জন্য আমার এই খুদ্র পুস্তকের অবতরণিকা। ইহা পাঠে যদি কোন মহাত্মার তৃতীয় চক্ষু আবির্ভূত হয়, তবেই আমার শ্রম সাফল্য জ্ঞান করিব।

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।
গ্রন্থকার।

ভূমিকা।

—:*:—

ভগবান স্বয়ং গীতাতে বলিয়াছেন

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়ানানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞান চক্ষুষঃ ॥

একদেহ হইতে দেহান্তরে গমনকারী, অথবা দেহে অবস্থিত কিম্বা বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত, ও গুণত্রয় যুক্ত আত্মাকে মূঢ়গণ দেখিতে পায় না। জ্ঞাননেত্রযুক্ত মহাত্মা গণই আত্মাকে দেখিতে পান। সুতরাং জ্ঞাননেত্র বা সপ্তমেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনা করা যে প্রত্যেকে জীবেরই কর্ত্তব্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমার ক্ষুদ্র পুস্তিকায় যদি কোন ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টি কর্ষিত হয় তবে আমাকে কৃত কৃতার্থ বোধ করিব। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে, সপ্তমেন্দ্রিয় প্রকাশ করিব লিখিয়াছিলাম। আজ শ্রীগুরুর কৃপায় তাহা সম্পূর্ণ হইল। ওঁ তৎসৎ। ইতি—

অলমিতি বিস্তরেণ

কলিকাতা।
১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯

শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা
গ্রন্থকার।

যোগেশ্বরো হরি ওঁ ॥

ভূমিকা

আমার প্রণীত ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে সপ্তমেন্দ্রিয়ের আবির্ভাব সম্বন্ধে একটু আভাস দিয়াছি। এক্ষণে সপ্তমেন্দ্রিয় কাহাকে বলে তাহার একটু বিশ্লেষণ করা আবশ্যক বিবেচনা করায় এবং আমার প্রিয় শিষ্যগণের সপ্তমেন্দ্রিয় বিকাশের সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখা জানিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করায় এই পুস্তক লিখিত হইল। বলা বাহুল্য, যে এই গ্রন্থে ভাষার ছটা বা লেখনীর চাতুর্য্য কিছুই নাই। যে সকল শিক্ষিত যুবক বৃন্দ ভাষার ঔৎকর্য্য জন্য পুস্তক পাঠে অনুরক্ত, তাঁহারা আমার মৃতভ্রাতা ৺ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি নাট্যকারের গ্রন্থ আদর্শ স্বরূপ পাঠ করিবেন। "আমি একজন লেখক" এরূপ অভিমান আমার নাই। কেবল সাধক মণ্ডলীর নিকট আমার সানুনয় নিবেদন যে আমি বহুদিন তীর্থ ও বহু সাধু সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়া যোগ সম্বন্ধে যে টুকু সত্য বিশেষরূপে জানিতে পারিয়াছি, তাহাই সাধারণের উপকারার্থ আজ এই বৃদ্ধ বয়সে প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি। যোগ সাধন শিবসংহিতা বা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা প্রভৃতি যোগশাস্ত্রানুযায়ী প্রক্রিয়া জানিয়া নির্ব্বাহ করা বড়ই কঠিন। সুতরাং আমি জগদ্‌-গুরুর কৃপায় সেই সাধনের যেটুকু সহজ কৌশল পাইয়াছি তাহাই সাধক মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। আশাকরি, যে, এই প্রদর্শিত প্রক্রিয়া অবলম্বনে যদি একজন সাধকও সাফল্য লাভ করেন, তবে কৃতকৃতার্থ হইব।

প্রকাশক
শ্রীদুর্গাচরণ বিদ্যাভূষণ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ওঁ	ইতি জ্ঞান মাত্রেণ রাগাজীর্ণেন জীর্য্যতঃ। কাল নিদ্রা প্রপন্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১॥
ন	গতি র্বিদ্যতে নাথ ত্ব মেব শরণং প্রভো। পাপ পঙ্কে নিমগ্নোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ২॥
মো	হিতো মোহ জালেন পুত্র দার ধনাদিষু। তৃষ্ণায় পীড্যমানোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৩॥
ভ	ক্তিহীনঞ্চ দীনঞ্চ দুঃখ শোকা'তুরং প্রভো। অনাশ্রয়মনাথঞ্চ ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৪॥
গ	তাগতেন শ্রান্তোঽস্মি দীর্ঘ সংসার বর্ত্মসু। যেন ভূয়ো ন গচ্ছামি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৫॥
ব	হবোহিময়া দৃষ্টা যোনি দ্বারঃ পৃথক্ পৃথক্। গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৬॥
তে	ন দেব প্রপন্নোঽস্মি ত্রাণার্থে তৎ পরায়ণঃ। দেহি সংসার মোক্ষংত্বং ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৭॥
বা	চা যচ্চ প্রতিজ্ঞাতং কর্ম্মণা নকৃতং ময়া। সোঽহং কর্ম্ম দুরাচার স্ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৮॥
সু	কৃতংন কৃতং কিঞ্চিৎ দুস্কৃতঞ্চ কৃতং ময়া। ঘোর সংসার মগ্নো হস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ৯॥
দে	হান্তর সহস্রেষু চান্যোন্যাস্তং ভ্রামিতং ময়া। তির্য্যগ্ যোনি মনুষ্যেষু ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১০॥
বা	চয়ামি যথোন্মত্তঃ প্রলপামি তবাগ্রতঃ। জরামরণ ভীতোঽস্মি ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১১॥
য়	ত্র যত্র চ যাস্যামি স্ত্রীষু বা পুরুষেষুচ। তত্র তত্রা চলা ভক্তি স্ত্রাহি মাং মধুসূদন ॥ ১২॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসু দেবায়।

সপ্তমেন্দ্রিয়।

অবতরণিকা

যস্যাহং হৃদয় দাসং স ঈশো বিদধাতুমে।

যোগীরা বলেন পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রেই তাঁহার চৈতন্যময় স্বরূপ বিকাশ এবং প্রণবই তাঁহারা বাচক। সেই ব্রহ্মরন্ধ্রে উপস্থিত হইতে হইলে প্রাণকে অবলম্বন করিয়া ঐ ব্রহ্মমন্ত্র প্রণব সহ মেরুদণ্ডের ভিতরে ভিতরে চক্রে চক্রে মনকে উঠাইয়া ক্রমে ভ্রূমধ্যে আনিয়া স্থির করিতে হয়। তাহার পর মন **কোন অলৌকিক বলে** সহজেই প্রাণ সাহায্য ব্যতীত মস্তিষ্কে উঠিয়া গিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারে। এবং সেখানে গিয়া সেই সর্ব্বশক্তি কারণে সংযুক্ত হইয়া অনন্ত ব্রহ্মানন্দে বিভোর হইয়া যায়।

তাঁহারা আরও বলেন বজ্রানাড়ী সুষুম্মার মধ্যে স্বাধিষ্ঠান হইতে এবং চিত্রানাড়ী মণিপুর হইতে উত্থিত হইয়াছে। মাথাটা চিতিয়ে দিলে যেস্থানে টোল খাইয়া যায়, তাহাকে মস্তিষ্ক গ্রন্থি বলে। মস্তিষ্ক গ্রন্থি হইতে সুযুম্না দুই শাখায় বিভক্ত। একটী শাখা আজ্ঞার কর্ণিকা ভেদ করিয়া কপালের মাঝামাঝি স্থানে এক সূক্ষ্ম ছিদ্র পাইয়া (পিনিয়াল গ্লাণ্ড) পার হইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া বক্রগঠিতে পিস্তুটারী দেহে প্রবেশ কয়িয়া উর্দ্ধমুখে খাড়া হইয়া সহস্রার ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। অন্য শাখাটী মস্তিষ্কের গ্রন্থি হইতে মাথার খুলির তলায় তলায়

শিখায় উঠিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করিয়াছে। এই শাখার মুখ,বন্ধ। প্রথম শাখার মুখ খোলা। যোগীর যোগাবলম্বনে প্রাণত্যাগ সময়ে ঐ শাখার বন্ধ মুখ খুলিয়া গিয়া উভয় শাখার ক্ষুদ্র বা সূক্ষ্ম ছিদ্র এক হইয়া যায়। ইহারই নাম ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাওয়া বা বিদেহ মুক্তি। ঐ পিস্থটারী ছিদ্রমধ্যে ৺নাদ বিন্দুকে অর্থাৎ অব্যক্ত ও চিত্তের সংযুক্ত স্থানকে কূট বলে। ঐ কূট ভেদ করিতে পারিলে প্রাকৃতিক আবরণ ভেদ, অর্থাৎ অজ্ঞানতা ভেদ হইয়া জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, যাহাকে সপ্তমেন্দ্রিয় বা প্রজ্ঞাচক্ষু, দিব্য চক্ষু বা ত্রিনেত্র বলে।

প্রথম অধ্যায়।

বায়ুতত্ত্ব।

এই শরীরের শাসনকর্ত্তা বায়ু! বায়ু দ্বারাই শরীরের ক্রিয়া চলচে। বায়ু একটু এদিক ওদিক হলে আর শরীর থাকে না। বায়ু প্রাণরূপে জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন। এই বায়ু সম ও সূক্ষ্ম হয়ে ক্রিয়া কর্‌লে জীবকে জ্ঞান দান করেন, ব্রহ্মত্ব দান করেন; এবং বিকৃত বা বিসম হইলে জীবকে পাগল করেন।

শাস্ত্রে আছে ;—

বায়ু র্বায়ু বলং বায়ু র্বায়ুর্ধাতা শরীরিণাম্।
বায়ু সর্ব্ব মিদং বিশ্বং প্রভু র্বায়ু প্রকীর্ত্তিতঃ॥

সুতরাং শরীরের শাসক এই বায়ুকে আয়ত্ত করিতে পারিলেই জীবের আত্মোন্নতি হয়। সেই জন্য এই বায়ু ক্রিয়া সম্বন্ধে যাহা নিয়ম আছে, তাহা প্রতি পালন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। প্রাণায়াম বা প্রাণ যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নিয়মকেই শাস্ত্র বিধি বলে। পণ্ডিতেরা বলেন বায়ু ৪৯ উনপঞ্চাশ প্রকার, এবং এই উনপঞ্চাশ বায়ু প্রতিদিন জীবের শরীর মধ্যে যথাক্রমে প্রবাহিত হইয়া থাকে, আর ঐ ৪৯ বায়ুর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ ও মিলনে নানা প্রকার ক্ষয়োদয় অর্থাৎ প্রকাশ ও বিবিধ চেষ্টা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দশটী প্রধান বায়ুর প্রক্রিয়া আমরা সকলেই প্রতিদিন অনুভব করিয়া থাকি।

দশটী প্রধান বায়ু এই (১) প্রাণ, (২) অপান, (৩) সমান (৪) উদান (৫) ব্যান (৬) নাগ (৭) কুর্ম্ম (৮) কৃকর (৯) দেবদত্ত (১০) ধনঞ্জয়।

মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া সুষুম্নার মধ্য দিয়া সহস্রার পর্য্যন্ত যে আকাশ ময় ছিদ্র আছে তাহারই নাম ব্রহ্মনাড়ী। ব্রহ্মনাড়ী সুষুম্নার মধ্যস্থিত বজ্রা (প্রাণবায়ু) ও তন্মধ্যস্থ চিত্রার মধ্যে দিয়া উঠে সমুদয় চক্রকে ভেদ করেচে। এর মধ্যে মন প্রবেশ করানর নামই কুণ্ডলিনী শক্তি জাগান। ইহা অতি সহজ। "ইহা হুঙ্কার দ্বারা বা অশ্বিনী মুদ্রা দ্বারা জাগাইতে হয়" প্রভৃতি ক্রিয়ার কোন প্রয়োজন করে না। কেবল মনোমধ্যে এইরূপ কিছুক্ষণ ধ্যান করিলেই কুণ্ডলিনী শক্তি আপনিই জাগিয়া উঠেন। কুণ্ডলিনী ব্রহ্ম নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেই

শুদ্ধ বুদ্ধির প্রকাশ হয়। এই জন্য এই ব্রহ্ম নাড়ীকে অনেকেই জ্ঞান নাড়ী বলিয়া থাকেন। অন্তঃ করণের অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধি অশুদ্ধি অনুসারেই আত্ম জ্যোতি সতেজ, নিস্তেজ বা ক্ষীণ হয়। যে সকল অবিবেকীপুরুষ প্রাণায়াম নাকোরে শ্রুতি স্মৃতি বিগর্হিত ভয়ঙ্কর তপস্যা করে, শরীরকে শুকিয়ে ক্ষীণ অকর্ম্মণ্য ক'রে ফ্যালে, তাহারাও ফলে শরীরের অন্তঃস্থ অন্তরাত্মাকে ক্ষীণ করে। তাহারা দাম্ভিক ও কামনা পরায়ণ হওয়ায় কামনা পূরণের জন্য যে উপায় স্থির করে, তাহাই করে, অহঙ্কার ভরে মনে করে তাহারা নিজে যা কোচ্চে বা বুঝেছে তাহাই ঠিক, আর কেউ কিছু বোঝে না। এইরূপে তাহারা কামনা সক্ত হওয়ায় তাহাদের চিত্ত বিষয় ভাবনায় মলিন হয়। সুতরাং তাদের বুদ্ধি এইরূপ মলিন হওয়ায় আত্মজ্যোতি আর তাহাদিগকে আলোকিত করিতে পারে না, ক্রমে ক্ষীণ হয়।

স্বামী ভাস্করানন্দ স্বরস্বতী বলিয়াছেন, যে সংসার ত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া যোগসাধন করিলেই যে, "ঈশ্বরকে লাভ করা যায়, এমত নহে। সংসারী ও সংন্যাসী উভয় যোগী যদি চিত্ত ও মনকে স্থির রাখিতে পারেন, তবেই তাঁহার সাক্ষাৎ পান। মানবের সমস্ত গুণই আছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকায় মনুষ্য সে সমস্ত গুণ কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। যোগদ্বারা সেই অজ্ঞানরূপ অন্ধকারকে দূর করা যায়। যোগ বল সম্পন্ন মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই।"

যোগসাধন করিতে হইলে উত্তমরূপে দেহ তত্ত্ব ও দেহস্থিত

চক্রাদি অবগত হইতে হয়, নতুবা সাধনে কোন ফল হয় না। ভূর্ভুবঃ সঃ এই তিন লোক মধ্যে যত প্রকার জীব আছে তৎ সমস্তই জীব দেহের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে। জীবদেহে সমুদয় নদ নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রপাল প্রভৃতিও অবস্থান করিয়া থাকে। চন্দ্র ও সূর্য্য এই দেহে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন। আর পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ুও আকাশ রূপী পঞ্চ মহাভূতও এই দেহে অধিষ্ঠিত। যে ব্যক্তি দেহের এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ যোগী। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে দেহ তত্ত্বটী জানা উচিত।

যোগ শাস্ত্রানুসারে সমস্ত জন্তুরই দেহের পরিমাণ তাহাদের নিজ অঙ্গুলির ৯৬ অঙ্গুলি মাত্র। ভৌতিক দেহের পরিমাণ হইতে প্রাণ বায়ু দ্বাদশাঙ্গুলি অধিক, সুতরাং ঐ দ্বাদশাঙ্গুলিও দেহ নামের অন্তর্গত। নিশ্বাস কালে প্রাণবায়ু নাসিকাগ্র হইতে দ্বাদশাঙ্গুল বহির্ভাগে আগমন করে। কন্দ মধ্যে যে নাড়ী সংস্থিত আছে উহা সুষুম্মা নামে অভিহিত। নিখিল নাড়ীই এই কন্দ চক্রের চতুস্পার্শে অবস্থিত। নাড়ী পুঞ্জের মধ্যে ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না, স্বরস্বতী, বারুণী, পূষা হস্তিজিহ্বা যশস্বিনী, বিশ্বোদরী, কুহু, শঙ্খিনী, পয়োস্বিনী, অলম্বুষা ও গান্ধারী এই চতুর্দ্দশ নাড়ীই প্রধান। পূর্ব্বোক্ত প্রাণাদি দশবায়ু নিরন্তর ঐ সকল নাড়ী সমূহে সঞ্চরণ করিতেছে।

মুখও নাসিকার মধ্যে, হৃদয় মধ্যে, নাভিতে এবং শরীর মধ্যে পাদাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত এই প্রাণ বায়ু সংস্থিত আছে। ব্যাগ্র

নামক বায়ু কর্ণাদির মধ্যে এবং গুল্‌ফদ্বয় নাসিকা গ্রীবা, ঘাড় ও কোটির অধোদেশ, এই সমস্ত স্থানে বিদ্যমান আছে। গুহ্য, লিঙ্গ উরু, জানু, জঠর, অণ্ডকোষ, কটি, জঙ্ঘা ও নাভি স্থানে অপান বায়ুর বসতিস্থল। উদান নামক বায়ু করের চরণের এবং নিখিল সন্ধিস্থানে অবস্থিতি করে। সমান সংজ্ঞক বায়ু দেহের সর্ব্বস্থল ব্যাপিয়া সংস্থিত।

নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস প্রাণ বায়ুর ক্রিয়া; মল মূত্রাদির নিঃসারণ অপান বায়ুর কার্য্য, ক্ষয়ও সংগ্রহ ব্যান বায়ুর ক্রিয়া; দেহের উন্নয়নাদি উদান বায়ুর কর্ম্ম এবং শরীরের পোষণাদি সমান বায়ূর কার্য্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। উদ্গারাদি নাগ বায়ুর কর্ম্ম; সঙ্কোচন নামক ক্রিয়া কূর্ম্ম বায়ুর কার্য্য; ক্ষুধা ও পিপাসা কৃকর বায়ুর ক্রিয়া এবং নিদ্রা দেবদত্ত নামক বায়ুর কার্য্য বলিয়া অভিহিত। শোষনাদি ব্যাপার ধনঞ্জয়াখ্য বায়ুর কর্ম্ম। যোগ সাধন কালে অঙ্গন্যাস দ্বারা এই সকল নাড়ীর শোধন করা কর্ত্তব্য। প্রত্যেক জীব শরীরই শুক্র, শোণিত, মজ্জা, মেদ মাংস, অস্থি ও ত্বক এই সপ্ত ধাতুদ্বারা নির্ম্মিত। মৃত্তিকা জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ ভূত হইতে শরীর নির্ম্মাণ-সমর্থ এই সপ্তধাতু এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদি শরীর ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চভূত হইতে এই শরীর জাত বলিয়া উহাকে ভৌতিক দেহ বলে। ভৌতিক দেহ নিজ্জীব ও জড় স্বভাবাপন্ন, কিন্তু ইহা চৈতন্যরূপী পুরুষের আবাস ভূমি হওয়াতে সচেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

শরীরের অভ্যন্তরে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানের জন্য **স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে ঐ স্থান গুলিকে চক্র** বলে। তাহারা আপন আপন চক্রে অবস্থান করতঃ শারীরিক সমস্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। গুহ্য দেশে মূলাধার চক্রটী পৃথ্বী তত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রটী জল তত্ত্বের স্থান, নাভি-মূলে মণিপুর চক্রটী অগ্নি তত্ত্বের স্থান, হৃদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ু তত্ত্বের স্থান, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশ তত্ত্বের স্থান। যোগিগণ এই পাঁচটী চক্রে পৃথিব্যাদি ক্রমে পঞ্চভূতের ধ্যান করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত চিন্তাযোগ্য আরও কয়েকটী স্থান আছে। ললাট দেশে আজ্ঞাচক্রে পঞ্চ তন্মাত্রাতত্ত্ব, ইন্দ্রিয় তত্ত্ব, চিত্ত ও মনের স্থান। তদূর্দ্ধে জ্ঞান নামক চক্রে অহং তত্ত্বের স্থান। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে একটী শতদল চক্র আছে, তন্মধ্যে মহতত্ত্বের স্থান। তদূর্দ্ধে মহাশূন্যে সহস্র দলচক্রে প্রকৃতি পুরুষ স্বরূপ পরমাত্মার স্থান। যোগিগণ পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব এই ভৌতিক দেহে চিন্তা কারিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভগ্‌বদগীতার অষ্টাদশোহধ্যায়ে ৪৮ শ্লোকে আছে
"সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষ মপি ন ত্যজেৎ।"
সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ॥

এই শ্লোকের শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ গিরি পরমহংস যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি তাহাই সমীচীন বিবেচনা করি। তিনি যেরূপ

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। সহজ অর্থাৎ জন্ম সহ জাত এই অর্থে সহজ। জন্মর সঙ্গে জন্মায় কোন কর্ম্ম? প্রাণ ক্রিয়াই জন্মসহ জন্মায়। তাই প্রাণ ক্রিয়াকে সহজ কর্ম্ম বলে। জীব যতদিন মাতৃগর্ভে থাকে, ততদিন তার শ্বাস প্রশ্বাসের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকে না। মাতৃশরীরের ক্রিয়া দ্বারাই নাড়ী সহযোগে তার শরীরে প্রাণক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সেসময় তার শরীরে প্রাণ প্রবাহ অতি সূক্ষ্ম রূপে তাহার ব্রহ্মনাড়ীতে বহিতে থাকে। তা হতেই সপ্তধাতুর পুষ্টি সাধন হোতে থাকে। ভূমিষ্ঠ হবামাত্র যেই নাসারন্ধ্রে শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হয়, অমনি অন্তরের প্রাণ প্রবাহ ঐ নাসারন্ধ্রের প্রবাহের সঙ্গে মিলে ক্রমে বহির্ম্মুখ হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নবৎ পূর্ব্ব স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। বাহিরের বিষয় সম্পর্কে এসে মোহিত হোয়ে পড়ে। তাই সাধক রাম প্রসাদ গেয়েচেন, "গর্ভে যখন, যোগী তখন, ভূমে পড়ে খেলাম মাটী"। এই মাটী খাওয়াই বিষয় সংস্পর্শে মোহিত হওয়া। তাই যোগ সাধনার উদ্দেশ্য হোচ্চে ঐ প্রাণ প্রবাহকে পুনরায় অন্তর্ম্মুখকরা। কারণ, প্রাণ অন্তর্মুখ হইলেই মোহের বিনাশ হয়। স্মৃতি জেগে উঠে। আর আত্ম জ্ঞানোদয়ে জগৎ আনন্দ ময় হয়। প্রাণের ঐ অন্তর্মুখ প্রবাহই সহজ কর্ম্ম। উহা বিষয় সংস্পর্শে এসেই ক্রমে বহির্মুখ হয়ে পড়েছে। শ্রীগুরুদেব যোগ দীক্ষার সংস্কারের সময় ঐ প্রবাহটী অন্তর্মুখ করে দিয়ে অখণ্ড মণ্ডলাকার "তৎ পদ" দর্শন করিয়ে দেন। কিন্তু প্রবাহের সে

পরিবর্ত্তন বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। বিকর্ম্ম তাড়ণে শীঘ্রই আবার ফিরে যায়। কাজেই, তার জন্য নিজে সাধনা করিতে হয়। ঐ প্রবাহটী পুনরায় অন্তর্মুখ করার চেষ্টায় প্রথমেই অনেক টুকু আয়াস স্বীকার করিতে হয়। সুখে হয় না। আর প্রথম প্রথম ঐ চেষ্টা ঠিকও হয় না। বিষয়াকর্ষণে ঠিক্‌রে বেরিয়ে পড়তে হয়। সেই আয়াস টুকুকেই সেই অঠিক চেষ্টাকেই দোষ বলা হয়েচে। তাই ভগবান অর্জ্জুনকে বলচেন, সদোষ হলেও সহজ কর্ম্ম (অন্তর্মুখে প্রাণ চালান) ত্যাগ করতে নেই। কারণ সব কাজই আরম্ভকালে নির্দ্দোষ হয় না। দোষাচ্ছন্ন থাকে, যেমন আগুন্ উৎপন্ন কালে ধোঁয়াচ্ছন্ন থাকে।

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে"।

এই বচন থেকে জানাযায়, যে যতদিন সংস্কার অর্থাৎ উপনয়ন না হয়, ততদিন শূদ্র অবস্থা। উপনয়নকে এক কথায় অন্তর্দ্দৃষ্টি বলা যেতে পারে। আমাদের এই দুই চোখে প্রত্যেক বিষয়ের বহির্ভাগমাত্র দর্শন হইয়া থাকে, কিন্তু সেই বিষয়ের অন্তর ভাগ লক্ষ্য হয় না। তাই শ্রীগুরুদেব দীক্ষা কালে আমাদের ভ্রূমধ্যে একটী দিব্য চক্ষু ফুটিয়ে দেন। সে চোখে বাহিরে দেখা যায় না। ভেতরে ভেতরে চাইলে তাতে অনেক বিষয় দেখতে পাওয়া যায়। সে চোখের দৃক্ শক্তি সাধারণতঃ আবরণে ঢাকা। দীক্ষার পর অভ্যাস দ্বারা সেই আবরণ সরাতে হয়। আবরণ সরাতে পাল্লে সে চোখে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সব দেখাযায়। শাস্ত্রে সে চোখকে দিব্যচক্ষু

তৃতীয়নেত্র, জ্ঞান চক্ষু, প্রজ্ঞা চক্ষু প্রভৃতি নানা নামে বর্ণনা করা আছে। গুরুদেব ঐ চোখ ফুটিয়ে দেন বলে, গুরু প্রণামে আছে, "চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।" সংস্কার হোলে পরেই শুদ্রত্ব গিয়ে দ্বিজত্ব আসে। এই সংস্কারকে দ্বিতীয় জন্ম ও বলে। আমি ঐ জ্ঞান চক্ষুর নাম সপ্তমেন্দ্রিয় দিয়াছি। একজন্ম হচ্চে, মাতৃগর্ভ হতে বহির্জগতে ভূমিষ্ঠ হওয়া। আর এক জন্ম হচ্চে দীক্ষা সংস্কার। যাতে বহির্বিষয় ছেড়ে অন্তর্জগতের বিষয় লক্ষ্য হ'তে থাকে।

যেমন মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম হলেই প্রাণ ক্রিয়া অন্তর্মুখ গতি ছেড়ে বহির্মুখ গতি লয়, অর্থাৎ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ক্রিয়ার বহির্মুখ গতি হয়, তেমনি দীক্ষা হলেই প্রাণ ক্রিয়াও সেই সঙ্গে সঙ্গে রুপান্তরিত হ'য়ে ক্রমে অন্তর্মুখ হ'তে থাকে। প্রাণের বহির্মুখ গতিতে যেমন বিষয়াকারা বৃত্তির উদয় হয়, তেমনি প্রাণের অন্তর্মুখ গতিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বৃত্তির উদয় হয়, এবং তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর্ত্তে হয়। সে সব কর্ম্ম তাৎকালিক প্রাণ ক্রিয়ার পোষক এবং বর্দ্ধক। এজন্য সেগুলি অবশ্য কর্ত্তব্য; তাই সে গুলিকে সহজ বা স্বভাবজ কর্ম্ম বলে।

"কায়া নগর মধ্যেতু মারুতঃ ক্ষিতিপালকঃ"

দেহ নগর মধ্যে বায়ু রাজা স্বরূপ। প্রাণ বায়ু নিঃশ্বাসও প্রশ্বাস এই দুই নামে বিভক্ত; বায়ু গ্রহণের নাম নিঃশ্বাস ও

বায়ু পরিত্যাগের নাম প্রশ্বাস। জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নিয়ত শ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য চলিতেছে। এই নিশ্বাস প্রশ্বাস ও আবার একসময়ে দুই নাসিকায় সমভাবে চলে না। বাম নাসাপুটের নিশ্বাসকে ইড়ানাড়ীর প্রবাহ এবং দক্ষিণ নাসা পুটের নিশ্বাসকে পিঙ্গলা নাড়ীর প্রবাহ এবং উভয় নাসাপুটে নিশ্বাস সমান ভাবে বহিলে সুযুম্মায় প্রবাহ বলে। যোগ মার্গে সাধনায় শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বিশেষ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক যেমন জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার সংযোগ সাধন করা যায়, তেমনি শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিলে ভাবী বিপদাপদ ও মঙ্গলা মঙ্গল জ্ঞাত হওয়া যায়। কিন্তু সেই সকল কৌশল স্বরোদয় শাস্ত্রের অন্তর্গত, সুতরাং এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই পুস্তকের উদ্দেশ্য সপ্তমেন্দ্রিয় লাভ করিয়া ভগবানকে দর্শন বা অনুভব করা। অর্থাৎ অজ্ঞানতা দূর করিয়া জ্ঞান লাভ করা বা মোক্ষলাভ করিয়া সংসারের ক্লেশ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া। কারণ প্রাণ তোষিনী প্রভৃতি তন্ত্র শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "জ্ঞানান্মুক্তি জ্ঞানান্মুক্তি, জ্ঞানান্মুক্তি ন সংশয় ॥

মোক্ষ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ জগতে নাই। সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করাকেই মোক্ষ বলে। শাস্ত্রে ত্রি সত্য করিয়া বলিতেছেন, যে জ্ঞান হইলেই মুক্তি। সুতরাং এই উপদেশ যে ধ্রুব সত্য ; সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ গীতা শাস্ত্রে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন।

"নতুমাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যংদদামিতে চক্ষুঃ পশ্যমে যোগমৈশ্বরং॥

হে অর্জ্জুন! তুমি সামান্য চক্ষুর দ্বারা আমার এই রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না। আমি এই জন্য তোমাকে দিব্য চক্ষু দান করিতেছি, তুমি তদ্বারা আমার যোগেশ রূপ দর্শন কর। ভগবানের এক এক লোমকূপে স-চরাচর সমগ্র জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে। সে সমস্ত জগৎ সম্পূর্ণ রূপে ভ্রমণ করিয়া জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মানবের কত জন্ম জন্মান্তর কাটিয়া যাইবে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং ভগবান তাঁহার প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে সহজে যাহাতে সেই জ্ঞানলাভ হয়, তাহাই দেখাইয়া দিলেন। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালের ঘটনা সমস্তই ভগবৎ সত্তায় বিদ্যমান রহিয়াছে। মানবের প্রাকৃতিক ইন্দ্রিয় বা মনো বুদ্ধি দ্বারা ভগবান্‌কে দর্শন বা অনুভব করা যায় না, কারণ তিনি অবাংমানসো গোচর। সুতরাং তাঁহাকে দেখিতে হইলে দিব্য চক্ষুর প্রয়োজন। কিন্তু মনুষ্য তাহা নিজ যত্ন বা চেষ্টার দ্বারা লাভ করিতে পারে না। যিনি ভগবানের শরণাগত হন, তাঁহাকেই কেবল করুণানিধান ভগবান্ কৃপা করিয়া দিব্য দৃষ্টি দান করেন।

যোগী গুরু বলেন, ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই প্রধান তিনটী নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সর্ব্বপ্রধানা। ঈড়া, গঙ্গারূপা পিঙ্গলা যমুনা স্বরূপা; আর সুষুম্না স্বরস্বতী রূপিনী। এই তিন নদী আজ্ঞা চক্রের উপরে যেস্থানে মিলিত হইয়াছে সেই

স্থানের নাম ত্রিকুট বা **ত্রিবেণী,** যাহাকে আমি পিস্টুটারী দেহ বলিয়াছি। গুরুর কৃপায় যিনি আত্মতীর্থ জ্ঞাত হইয়া আজ্ঞা চক্রোর্দ্ধে এই তীর্থ রাজ ত্রিবেনীতে মানস স্নান বা যৌগিক স্নান করেন। তিনি নিশ্চয়ই মুক্তিপদ লাভ করেন। ইহাই শিব বাক্য ; শিব বাক্যে কাহারও সন্দেহ নাই।

সুষুম্নার গর্ভে বজ্রিনী নামক একটী নাড়ী আছে। ঐ বজ্রিনী নাড়ীর অভ্যন্তরে মাকড়সার জালের মত অতি সূক্ষ্ম চিত্রানী নাম্নী আর একটী নাড়ী আছে। এই চিত্রানী নাড়ীতে মূলাধারাদি পদ্ম বা চক্র সকল গ্রথিত আছে। চিত্রানী নাড়ীর মধ্যে আর একটী বিদ্যুৎবর্ণা নাড়ী আছে যাহার নাম ব্রহ্মনাড়ী। ব্রহ্মনাড়ীটী মূলাধার পদ্মস্থিত স্বয়ম্ভু লিঙ্গ মহাদেবের মুখ বিবর হইতে উত্থিত হইয়া শিরস্থিত সহস্রদল পদ্ম পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আছে। ব্রহ্মনাড়ীটী অহনিশ যোগিগণের চিন্তনীয়, কারণ, যোগসাধনায় চরম ফল এই ব্রহ্ম নাড়ীটী হইতে লাভ হইয়া থাকে। এই ব্রহ্ম নাড়ীর ভিতর দিয়া মনকে সহস্রদল পর্য্যন্ত লইয়া যাইলে আত্ম জ্যোতি বা আত্ম সাক্ষাৎ কার লাভ হয়। ঐ চিত্রানী নাড়ীতে গ্রথিত পদ্ম বা চক্র গুলি সর্ব্বতো মুখী ; যাঁহারা ফল কামনা করেন, তাঁহারা ঐ পদ্ম গুলিকে অধোমুখী, চিন্তা করিবেন আর যাঁহারা মোক্ষাভিলাষী, তাঁহারা উর্দ্ধমুখী চিন্তা করিবেন।

ভৌতিক দেহে যত প্রকার শারীরিক কার্য্য হইয়া থাকে তৎসমস্তই বায়ুর সাহায্যে সম্পন্ন হয়। এক চৈতন্যের সাহায্যে

এই জড় দেহে বায়ুই জীবরূপে সমস্ত দৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরয়োপণিষৎ প্রথমা বল্লীর শান্তি পাঠে আছে যথা :—

ওঁ শন্নো মিত্রঃ শং বরুণো শং ণো ভবত্বর্যমা। শংন ইন্দ্রো ব্রহস্পতি শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্ম বদিষ্যামি। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্ বক্তার মবতু। অবতু মাম। অবতু বক্তারম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দিবসাভিমানিনী মিত্র দেবতা আমাদিগের সুখ দায়িনী হউন। রাত্র্যভিমানিনী বরুণ দেবতা আমাদের সুখ দায়িনী হউন। চক্ষুরভিমানিনী অর্য্যমা দেবতা আমাদের সুখ দায়িনী হউন। বলাভিমানিনী ইন্দ্র দেবতা এবং বুদ্ধ্যাভিমানিনী ব্রহস্পতি দেবতা ও উরুক্রম বিষ্ণু আমাদিগের সুখদায়ক হউন। ব্রহ্মকে নমস্কার।

হে বায়ো! তোমাকে নমস্কার। তুমিই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম। তোমাকেই প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম বলিব। যথার্থ জ্ঞানবান বলিব ও যথার্থ জ্ঞান পূর্ব্বক বক্তা ও কর্ত্তা বলিব। আমি বিদ্যার্থী, ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম বক্তাকে রক্ষা করুন। ব্রহ্ম আমাকে রক্ষা করুন ও বক্তাকে রক্ষা করুন। ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, যে আমাদের দেহ কেবল যন্ত্র মাত্র; বায়ু ঐ যন্ত্রটী চালনা করিবার উপকরণ। সুতরাং

বায়ুকে বশ করার উপায়ের নাম যোগ সাধনা। বায়ু বশ হইলেই মন বশ হয়; মন স্ববশে আসিলে ইন্দ্রিয় জয় করা যায়; ইন্দ্রিয় জয় হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে পবন বিজয় করিয়া চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তজ্জন্য মানব মাত্রেরই যোগ সাধন করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যোগতত্ত্ব।

আমি পূর্ব্বে ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে বলিয়াছি যোগ সিদ্ধ ব্যক্তি অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন, যোগবলে দূরদর্শন, দূর শ্রবণ, বীর্য্যস্তম্ভন ও পরকায় প্রবেশ প্রভৃতির ক্ষমতা জন্মে এবং অন্তর্যামিত্ব ও শূন্য পথে গমনাগমনের শক্তি লাভ করা যায়। যোগ প্রভাবে এই সকল শক্তি লাভ করা যায় বটে, কিন্তু শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যোগ সাধন করা কর্ত্তব্য নহে। যোগসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। ব্রহ্মোদ্দেশ্যে অর্থাৎ পাকা "আমি" হইবার জন্যই যোগসাধন আবশ্যক। কারণ "পাকা আমি" হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। বিভূতি আপনিই বিকশিত হয়।

কঠোপনিষৎ যষ্ঠী বল্লী ৯ শ্লোকে বলেন, যথা—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য।
ন চক্ষুযা পশ্যতি কশ্চনৈনম্॥
হৃদা মনীষা মনসা ভিক্ ৯ প্তো।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অস্য (আত্মনঃ) রূপং সন্দৃশে (সম্যক দর্শন বিষয়ে) ন তিষ্ঠতি। অর্থাৎ আত্মার রূপ, দর্শনের বিষয় হয় না (অর্থাৎ তিনি দর্শনেন্দ্রিয় গোচর হইবার যোগ্য নহেন।

কশ্চনঃ এনম্ চক্ষুষা ন পশ্যতি (কেহ তাঁহাকে চর্ম্ম চক্ষু বা সাধারণ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। জ্ঞান চক্ষু, বা তৃতীয় নেত্র বা সপ্তমেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পান)

হৃদা (হৃৎস্থয়া) মনীষা (সংশয় রহিতেন) মনসা (মনন রূপেন সম্যক দর্শনেন) [সঃ] অভিক্ ৯ প্তঃ (অভিপ্রকাশিতঃ [ভবতি]। অর্থাৎ হৃৎস্থিত সংশয় রহিত মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যে এতৎ (এনম্ আত্মানং বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি। যাঁহারা ইঁহাকে (আত্মাকে) জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

"যদা পঞ্চা বতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরা মিন্দ্রিয় ধারণাম্।
অপ্রমত্ত স্তদা ভবতি যোগোহি প্রভাব্যয়ৌ॥ ১০।১১

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি [নিজ বিষয়] চেষ্টা করেনা, তাহাকে (সেই অবস্থাকে)।

[জ্ঞানিগণ] পরম গতি বলেন। সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে। তখন যোগী অপ্রমত্ত হয়েন ; যে হেতু যোগেরও উৎপত্তি আছে ও অপায় (নাশ) ও আছে, অতএব অপায় পরিহারের জন্য অপ্রমত্ত থাকা উচিত।

পাঠক! উপরি উক্ত শ্লোক ত্রয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে জানাযায়, (১ম) যে যোগসাধনে সিদ্ধি লাভে যত প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে সংশয় অর্থাৎ সন্দেহই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। সংশয় বহিত মনন দ্বারা (আত্মা) প্রকাশিত হন।

২য়। "হৃৎস্থিত"—(হৃদয়) কাহাকে বলে। অনেকের ধারণা আছে যে মানব দেহের অভ্যন্তরে হৃদ্দেশ, ঠিক দুই ফুস্‌ফুসের মধ্য স্থানে পুলিপিঠার ন্যায় মাংস পিণ্ড। যেখানে অনাহত চক্রে বায়ু যন্ত্রে প্রাণ অধিষ্ঠিত আছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, হৃদয় আজ্ঞাচত্র হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে অবস্থিত। যোগ শাস্ত্রের হৃদয় বলিতে কূট স্থান বা (ইংরাজিতে Pituta-ry body) বুঝায়। যে পর্য্যন্ত প্রাণ বায়ু স্থষুম্নার বিবর মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ নাকরে, সে পর্য্যন্ত চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি প্রবাহের নিবৃত্তি হয় না। যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগ দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সুতরাং চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রাণ সংরোধ।

(৩) যোগ কি ? যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে। যোগশাস্ত্র সেই জন্য বলেন যে—

"সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে"

যৎকালে মনুষ্য সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার সেই মনের লয় অবস্থাকে যোগ বলে। পাতঞ্জল ঋষি সেই কারণে বলিয়াছেন যে যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ।

যখন বুদ্ধি নিজ বিষয়ও চেষ্টা করে না, অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সকলকে রুদ্ধ বা নিরোধ করার নাম যোগ। বাসনা জড়িত চিন্তাকে বৃত্তি বলে। চিত্তের এই বৃত্তি প্রবাহ জাগ্রত ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতে মানব হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। বাসনার একান্ত নাশ নাই। উহাকে দমন করা সুকঠিন। বাসনার বিশুদ্ধিকেই উহার নাশ বলে।

বাসনাকে শ্রীভগবানে সমর্পণ ভিন্ন অন্য উপায়ে উহার নাশ বা বিশুদ্ধি সম্ভবে না। সুতরাং উহাকে দমন করা, উহার বহির্বিষয়ে প্রবাহিত হইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা এবং উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষে, প্রণবধ্যান ও ষটচক্র ভেদ দ্বারা সহস্রারে লইয়া যাইয়া তাঁহাতে সমর্পণ করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নহে। কিরূপে প্রণবধ্যান ও ষটচক্র ভেদ করা যায় তাহার উপায় পরে বর্ণিত হইবে।

(৪র্থ) শরীরাভ্যন্তরে পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, ঐ স্থানগুলিকে চক্র বলে। তাহারা আপন আপন চক্রে অবস্থান করতঃ শারীরিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। গীতা একখানি যোগ শাস্ত্র। এই

গীতা শাস্ত্রে মহা যোগেশ্বর হরি অর্জ্জুনকে যোগ শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাণায়াম ও ষটচক্র ভেদ ইত্যাদির উপদেশ দিয়াছেন। গীতা-অভ্যাস, ত্যাগী পুরুষ ভিন্ন অন্যপুরুষে সম্ভবেনা।

গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রটী পৃথ্বী তত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রটী জলতত্ত্বের স্থান, নাভিমূলে মণিপুর চক্রটী অগ্নি-তত্ত্বের স্থান, হৃদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ু তত্ত্বের স্থান, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশ তত্ত্বের স্থান। মোক্ষাভিলাষী যোগীগণ এই পাঁচটী চক্রে পৃথ্ব্যাদি তত্ত্বের বিষয়গুলি ধ্যান করিয়া ক্রমে ক্রমে সবই পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা চক্রে যাইয়া মন স্থির করেন। ললাট দেশে আজ্ঞা নামক চক্রে পঞ্চতন্মাত্রাতত্ত্ব, ইন্দ্রিয় তত্ত্ব, চিত্ত ও মনের স্থান। তদূর্দ্ধে জ্ঞান নামক চক্রে অহং তত্ত্বের স্থান। তদূর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে একটী শতদল পদ্ম বা চক্র আছে। তন্মধ্যে মহতত্ত্বের স্থান। তদূর্দ্ধে মহাশূন্যে সহস্র দল চক্রে প্রকৃতি পুরুষ রূপ পরমাত্মার স্থান। যোগীগণ পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব অপ্রমত্ত্য ভাবে এই ভৌতিক দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন। অষ্ট সিদ্ধির জন্য চিন্তা করিলেই বিভূতি হয়, কিন্তু মোক্ষের অপায় বা নাশ হয়।

এক্ষণে কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। মূলাধার পদ্ম মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম নাড়ী মুখে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন (বিশেষ বিবরণের জন্য ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ) তাঁহার গাত্রে দক্ষিণা-বর্ত্তে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ বা জীবাত্মা।

যোগীরা বলেন ইনি ব্রহ্মনাড়ীর দ্বার রোধ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তন পরিত্যাগ করিয়া বিষয় সুখে আবদ্ধ আছেন। যাবৎ তিনি জাগরিত না হইবেন, তাবৎকাল, মন্ত্র, জপ, পূজা ও অর্চ্চনা বিফল।

যোগানুষ্ঠান দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই মানব জীবনের পূর্ণত্ব। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান পাঠে সাধকের ঐ শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে ও ঐ শক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিত হইয়া থাকেন। ধ্যান যথা—ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধার নিবাসিনীং।

তামিষ্ট দেবতা রূপাং সার্দ্ধত্রি বলয়ান্বিতাং।

কোটী সৌদামিনী ভাসাং স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টিতাং ॥

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ তেজ স্বরূপা দীপ্তিমতী। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ চক্রে চক্রে রমণ করেন। মনের মনন দ্বারা ইচ্ছা শক্তির আবির্ভাব হয়। প্রাণের গতি দ্বারা ক্রিয়া শক্তি কার্য্য করেন এবং বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞান শক্তি দ্বারা বহিস্থ ও অন্তরস্থ সমস্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়।

প্রমাণ যথা ঃ—ঐতরেয়ো-পনিষৎ পঞ্চম খণ্ড ২য় শ্লোক

"যদেতৎ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নাম ধেয়ানি ভবন্তি ॥" ২॥

যাহা প্রত্যেক বহিরিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান লাভ করিতেছে, সেই এক মাত্র হৃদয় বা অন্তঃকরণই জীবাত্মা। বা কূটস্থ চৈতন্য। হৃদয় ও মন একই বস্তু। মনের বৃত্তি অনেক। সংজ্ঞান বা অহং জ্ঞান, আজ্ঞান বা ঈশ্বরত্ব জ্ঞান, বিজ্ঞান বা সর্ব্বকলা জ্ঞান, মেধা বা শাস্ত্রার্থ-ধারণা, দৃষ্টি বা ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান, ধৃতি বা দেহ ধারণ শক্তি, মতি বা মনন, মনীষা বা মনন স্বাতন্ত্র্য. (গীতার "যথেচ্ছসি তথা কুরু") জূতি বা রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি বা স্মরণ. সঙ্কল্প বা সঙ্কল্পন, ক্রতু বা অধ্যবসায়. অসু বা প্রাণন, কাম বা অভিলাষ, বশ বা স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ, ইত্যাদি সমস্তই মনের বৃত্তি। উহারা প্রজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ আত্ম জ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞামাত্র ॥ ২॥

হংস বা সোঽহং ঃ

মরা মরা বলে বাল্মীকী রাম নাম পেলো।
হংস হংস বলে জীব ওঁকারে মিলিল ॥

জীব সর্ব্বদা সোঽহংএর বিপরীত" হংস' ইতিমন্ত্রেণ" জীবাত্মাকে বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসে হংস উচ্চারিত হয় ; অর্থাৎ শ্বাস বায়ুর নির্গমন সময়ে হং এবং গ্রহণ সময়ে সঃ এই শব্দ উচ্চারিত হয়। সঃকারে গ্রহণ, ইহাই শক্তি স্বরূপা ; হংকারে নির্গমন, ইহাই শিব স্বরূপ।

এই হংস শব্দকেই অজপা গায়ত্রী বলে। যতবার শ্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার "হংস" এই পরম মন্ত্র "অজপা" জপ হয়।

জীব এক অহোরাত্র মধ্যে ২১,৬০০ বার অজপা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। ইহাই মনুষ্যের স্বাভাবিক জপ এবং ইহাই জীবাত্মার অহোরাত্র সাধনা। হংসই জীবের জীবাত্মা। অহং ভাব আশ্রয় করিয়া এই জীবাত্মা মনুষ্য দেহে আছেন এবং সর্ব্ব প্রকার সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। যোগ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল হংসকে সোঽহংএ পরিবর্ত্তন করা এবং তদ্দারা ওঁকারকে প্রাপ্ত হওয়া। এই হংস বিপরীত "সোঽহং"ই সাধকের সাধনা। গুরু মুখে এই মহামন্ত্র শুনিলেই অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং যোগাভ্যাস বা সাধনা অতি সহজ। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিতে কোন কষ্ট নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যোগ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কারেরা উহাকে এক ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়া মানব মণ্ডলীকে এক মহামায়ায় মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছেন। জীবাত্মা সর্ব্বদাই এই "সোঽহং অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই শব্দ জপ করিয়া থাকেন এবং গুরুমুখে এই স্বতঃ উত্থিত হংস ও সোঽহং অর্থ অবগত হইয়া এবং ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রণবতত্ত্ব।

প্রণবের সম্যক তত্ত্ব প্রকাশ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। আমার বোধ হয় তাহার কারণ, অভক্ত, অবিশ্বাসী ও মূর্খ দিগের নিকট ইহা প্রকাশ করিলে কোন ফলোদয় হইবে না, বরঞ্চ যোগী দিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এই ভয়েই শাস্ত্রকারেরা ইহাকে গুহ্য বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ আমি হাতে পাইয়াছি। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমার কোন বন্ধু ঐ পুস্তক তাঁহার প্রতিবাসীগণের নিকট (যাঁহারা আমার পূর্ব্ব পরিচয় জানিতেন) পাঠ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন বলিয়া ছিলেন. আমরা দেখিতেছি যে গ্রন্থকার একজন ইঞ্জিনিয়র, রায় সাহেব, কুলীর সর্দ্দার; তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না; কারণ তিনি বাগবাজারে বাস করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ লেখা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। মোট কথা বিশ্বাসই জ্ঞান লাভের প্রকৃত ক্ষেত্র। যাহা হউক আমি গুরু মুখে ও শাস্ত্রে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহার প্রকাশ করাই আমার এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং তাহাই এস্থলে বর্ণনা করিব। ইহাতে গুহ্য বিষয় কিছুই নাই ও হাস্যাস্পদ হইবার কিছুই নাই। যোগ জটিল বা গুহ্য বিষয় নহে। থিয়োডোলাইট ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গ্রহণ পরিদর্শন, গ্রহ নক্ষত্রগণের স্থান নিরূপণ, ফনোগ্রাফে বা রেডিও

যোগে সঙ্গীত শ্রবণ ও টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ যেমন বাহ্য বিজ্ঞানের কাজ, যোগও সেইরূপ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কাজ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি হংস বিপরীত "সোঽহং" হয়। কিন্তু স, আর হ্‌ লোপ হইলে কেবল ওঁ থাকে। ইহাই হৃদয়স্থ শব্দ ব্রহ্মরূপ ওঁকার বা প্রণব ধ্বনি। সাধকগণ শব্দ ব্রহ্মরূপ প্রণব ধ্বনি (ওঁকার) শ্রবণেচ্ছায় দ্বাদশ দল বিশিষ্ট অনাহত পদ্ম উর্দ্ধমুখ চিন্তা করিয়া গুরুপদেশ অনুসারে ক্রিয়া করিবেন, তাহা হইলে ওঁকারধ্বনি কর্ণগোচর হইবে। যোগী গুরু বলেন, এই শব্দ ব্রহ্মরূপ ওঁকার ব্যতীত আর একটী বর্ণ ব্রহ্মরূপ ওঁকার আছেন। তাহা আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে নিরালম্বপুরে নিত্য বিরাজিত। ভ্রূমধ্যে দ্বিদল বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ আজ্ঞাচক্র (পিসুটারী দেহ ও পিনিয়ালগ্লাণ্ড) আছে। এই চক্রের উপরে যেস্থানে সুষুম্না ও শঙ্খিনী নাড়ী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে নিরালম্বপুরী বলে। তাহাই তারকব্রহ্ম স্থান। এই স্থানে ব্রহ্মনাড়ী আশ্রিত তারক বীজ প্রণব (ওঁকার) বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রণব বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ এবং শিব শক্তি যোগে প্রণবরূপ। শিব শব্দে হ-কার, তাহার আকার গজ কুম্ভের ন্যায় (হাতির মাথা) অর্থাৎ "ও" কার। ও-কার রূপ পর্য্যঙ্কে নাদ রূপিনী দেবী; তদুপরি বিন্দুরূপ পরমশিব। তাহা হইলেই ওঁকার হইল। সুতরাং শিব-শক্তি বা পুরুষ প্রকৃতির সমাযোগই ওঁকার। ওঁমীতীদং সর্ব্বং। সমস্ত জগৎই ওঁকারময়। তন্ত্রে এই ওঁকারের স্থূলমূর্ত্তি ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী বা রাজ-রাজেশ্বরী প্রভৃতি মহাবিদ্যা প্রকাশিত।

ওঁকার প্রণবের নামান্তর মাত্র। ওঁকারের তিন রূপ ; শ্বেত, পীত ও লোহিত। অ, উ, ম যোগে প্রণব হইয়াছে। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রণবে প্রতিষ্ঠিত আছে। অ-কার ব্রহ্মা উ-কার বিষ্ণু ও ম-কার মহেশ্বর। প্রণবে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ, এবং ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞান শক্তি এই তিন শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্য ইহাকে ত্রয়ী বলা হয় এবং বেদকে ত্রয়ী বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই ওঁকার জপ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয় তে॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছসি তস্য তৎ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রণব যুক্ত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রী জপে তিন প্রণব সংযুক্ত এবং ইষ্ট মন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব দ্বারা সেতু বন্ধন না করিয়া জপ করিলে ইষ্ট মন্ত্র জপ বিফল। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীর আদি ও অন্তে দুই প্রণব যোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ জপ নিস্ফল। গায়ত্রীর আদিতে ওঁকার, ব্যাহৃতির পর ওঁকার এবং গায়ত্রীর শেষে ওঁকার এই তিন স্থানে প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ করা কর্ত্তব্য॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি অ, উ, ম রূপ পর্য্যঙ্কে নাদরূপিনী অৰ্দ্ধ মাত্রা ও তদুপরি বিন্দুতে ওঁ-কার হয়। সুতরাং প্রণবে পঞ্চ দেবতা

আছেন। প্রণবের ষোড়শ কলা আছে। প্রণব জপ করার পূর্ব্বে সেই ষোড়শ কলার পূজা করা কর্ত্তব্য। যথা শিরসি

১ ২ ৩ ৪
অং নমঃ, উং নমঃ, মং নমঃ, অর্দ্ধ-মাত্রায়ৈ বা নাদায়ৈ নমঃ,

৫ ৬ ৭ ৮
বিন্দবে নমঃ, কলায়ৈ নমঃ, কলাতীতায়ৈ নমঃ, শান্তায়ৈ নমঃ,

৯ ১০ ১১
শান্তাতীতায়ৈ নমঃ, উনন্মন্যৈ নমঃ, মনন্মন্যৈ নমঃ। (গুহ্যমূলে)

১২ ১৩ ১৪
পরায়ৈ নমঃ, (মণিপুরে বা নাভী মূলে) পশ্যন্তৈ নমঃ, অনাহত

১৫ ১৬
চক্রে মধ্যমায়ৈ নমঃ, এবং কণ্ঠে বৈখর্য্যৈ নমঃ। এইরূপে পূজা করিয়া উদারা স্বরে দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদবৎ ও অবিচ্ছন্ন তৈল ধারার ন্যায় "ওঁ" উচ্চারণ করিয়া নিরালম্ব পুরীতে সেই তেজোময় তারক ব্রহ্ম স্থানে ওঁকার বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। সাধক যোগানুষ্ঠানে যথাবিধি ষট্ চক্র ভেদ করিয়া নিরালম্ব পুরীতে আসিলে আত্মজ্যোতি রূপ ব্রহ্ম "ওঁকার" অথবা আপন আপন ইষ্ট দেবদেবীর দর্শন পান ও প্রকৃত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। সকল দেবদেবীর বীজ স্বরূপ বেদ প্রতি পাদ্য ব্রহ্ম রূপ প্রণবতত্ত্ব অবগত হইয়া সাধন করিলে এই তারক ব্রহ্ম স্থানে জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।

প্রণবের উচ্চারণ ও তদর্থ চিন্তনই কর্ম্মযোগ এবং প্রাণকে আয়ত্ত করিবার উপায়।

ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওঁমিতীদং সর্ব্বম্। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন ওঁকার ব্রহ্ম। ওঁকার এই সমস্ত জগৎ। ওঁকার অনুকরণ সূচক বাক্য। শ্রোতা ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রবণ করাইতে বলিলে বক্তা শ্রবণ করাইয়া থাকেন। উদ্গাতা প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য নামক উদ্গান—কর্ত্তারা ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক সামগান করিয়া থাকেন। হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাব স্তোতা নামক হোতৃ চতুষ্টয় ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ঋক্ সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিক অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক হোমের অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক যিনি ব্রহ্ম প্রাপ্তির অভিলাষ করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বর্ণতত্ত্ব।

এক্ষণে মূলাধারাদি পদ্মের মাতৃকাবর্ণাত্মক দলের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

(১ম) মূলাধার পদ্ম চতুদ্দল বিশিষ্ট, চতুর্দ্দল, ব, শ, ষ, স এই চারি বর্ণাত্মক। মূলাধার পদ্মের বিশেষ বিবরণে (যাহা পরে লিখিত হইয়াছে) দেখিতে পাইবেন, যে ঐ স্থানে পৃথ্বী বীজের মূর্ত্তি ঐরাবত পৃষ্ঠে ঐশ্চর্য্য দেবতা ইন্দ্রের ক্রোড়ে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে বেদ উচ্চারণ করিতেছেন। সুতরাং উহাকে চতুর্দ্দল পদ্ম বলে। সাধক যখন ষটচক্র ভেদ করিবার চেষ্টা করিবেন,

তখন ঐ চতুর্দ্দলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের জন্য চারি ভাগে বিভক্ত বেদের চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিলে গদ্য পদ্যাদি বাক্‌সিদ্ধি ও আরোগ্যাদি লাভ হয়।

(২য়) **স্বাধিষ্ঠান পদ্ম** ষড় দল বিশিষ্ট; ষড়দলে- ব, ভ, ম, য, র, ল। এই ছয় মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, সর্ব্বনাশ ও ক্রুরতা এই ছয়টী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই পদ্মধ্যানে ভক্তি, আরোগ্য ও প্রভুত্বাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩য়) মণিপুর পদ্ম—দশদলযুক্ত, দশদল ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশ মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে, লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, সুষুপ্তি বিষাদ, কষায়, তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা ও ভয় এই দশটী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই পদ্ম ধ্যানে আরোগ্য ও ঐশ্চর্য্যাদি লাভ হয়।

(৪র্থ) অনাহত পদ্ম—দ্বাদশ দলযুক্ত—দ্বাদশ দল ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট ও ঠ। এই দ্বাদশ মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ এই দ্বাদশটী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে অণিমাদি অষ্টৈশ্চর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

(৫ম) বিশুদ্ধ পদ্ম—ষোড়শ দল বিশিষ্ট। ষোড়শ দল—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ৯, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং অঃ এই ষোল মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে, নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, এই সপ্ত স্বর, ওঁ হুং, ফট, বৌষট, বষট, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, বিষ ও অমৃত এই ষোলটী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই বিশুদ্ধ পদ্ম ধ্যান করিলে জরা ও মৃত্যুপাশ নিবারণ করিবার ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ। আজ্ঞা পদ্ম—দ্বিদল বিশিষ্ট—দুই দল—হ ও ক্ষ এই দুই মাতৃকা বর্ণাত্মক। এই পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে হ, ল্, ক্ষ ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। ত্রিকোণের তিন কোণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন দেব আছেন। আজ্ঞা চক্রের উপরে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মিলন স্থান। এই স্থানের নাম ত্রিকুট (পিনিয়াল গ্লাণ্ড ও পিসুটারী দেহ) এই ত্রিবেনীর উর্দ্ধে সুষুম্নার মুখে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার মণ্ডল। ঐ অর্দ্ধ চন্দ্রের উর্দ্ধে তেজঃ পুঞ্জ স্বরূপ একটী বিন্দু আছে। এই স্থানে বায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে এই পর্য্যন্ত ক্রিয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সপ্তমেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ। এই স্থান হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ধ্যানের ক্রিয়া। এই আজ্ঞা পদ্মের আর একটী নাম জ্ঞান পদ্ম। পরমাত্মা ইহার অধিষ্ঠাতা। এবং ইচ্ছা তাঁহার শক্তি। এই স্থানেই প্রদীপ্ত শিখা রূপিনী আত্মজোতি (যাহার বর্ণনা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে বিশেষরূপে

ব্যাখ্যাত হইয়াছে) সুপীত স্বর্ণ রেণুর ন্যায় বা ইলেক্ট্রিক আলোকের ন্যায় বিরাজমান। এই স্থানে যে জ্যোতি দর্শন হয়, তাহাই সাধকের আত্ম প্রতিবিম্ব। এই পদ্ম ধ্যান করিলে দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন হয় এবং জগতের প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

৭ম। ললনা চক্র—তালু মূলে রক্তবর্ণ চোষট্টি দল বিশিষ্ট ললনা চক্রের অবস্থান। এই পদ্মে অহং তত্ত্বের স্থান। এখানে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, আরতি সম্ভ্রম, উর্ম্মি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশটী বৃত্তি এবং অমৃত আছে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে উন্মাদ, জ্বর পিত্তাদিজনিত দাহ শূলাদি বেদনা এবং শিরঃপীড়া ও শরীরের জড়তা নষ্ট হয়।

৮ম। গুরুচক্র—ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্বেতবর্ণ শতদল বিশিষ্ট এই অষ্টম পদ্ম আছে। এই শতদল পদ্মে হংস পিঠের উপরি গুরু পাদুকা এবং সকলেরই গুরু আছেন। ইনি অখণ্ড মণ্ডলাকারে চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এই পদ্মের মস্তকোপরি সহস্র দল পদ্মটী ছত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই শত দল পদ্ম ধ্যান করিলে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ ও দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

নবম চক্র সহস্রার।

সহস্র দল কমল কর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রিকোণ চন্দ্র-কোটী মণ্ডল আছে তাহার অন্য নাম শক্তি মণ্ডল। এই শক্তি মণ্ডল মধ্যে তেজোময় তুরীয় বা বিসর্গাকার মণ্ডল বিশেষ আছে। ইহাই সৃষ্টির উৎপত্তি স্থান। তদুপরি মধ্যাহ্ন কালীন কোটী সূর্য্য

বায়ুকে বশ করার উপায়ের নাম যোগ সাধনা। বায়ু বশ হইলেই মন বশ হয়; মন স্ববশে আসিলে ইন্দ্রিয় জয় করা যায়; ইন্দ্রিয় জয় হইলেই সর্ব্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহাতে পবন বিজয় করিয়া চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তজ্জন্য মানব মাত্রেরই যোগ সাধন করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যোগতত্ত্ব।

আমি পূর্ব্বে ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে বলিয়াছি যোগ সিদ্ধ ব্যক্তি অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি লাভ করিয়া স্বেচ্ছাবিহার করিতে পারেন, যোগবলে দূরদর্শন, দূর শ্রবণ, বীর্য্যস্তম্ভন ও পরকায় প্রবেশ প্রভৃতির ক্ষমতা জন্মে এবং অন্তর্যামিত্ব ও শূন্য পথে গমনাগমনের শক্তি লাভ করা যায়। যোগ প্রভাবে এই সকল শক্তি লাভ করা যায় বটে, কিন্তু শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে যোগ সাধন করা কর্ত্তব্য নহে। যোগসাধনের প্রধান উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ। ব্রহ্মোদ্দেশ্যে অর্থাৎ পাকা "আমি" হইবার জন্যই যোগসাধন আবশ্যক। কারণ "পাকা আমি" হইলেই সর্ব্বজ্ঞ হওয়া যায়। বিভূতি আপনিই বিকশিত হয়।

কঠোপনিষৎ ষষ্ঠা বল্লী ৯ শ্লোকে বলেন, যথা—

ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য।
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্॥
হৃদা মনীষা মনসা ভিক্ ৯ প্তো।
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

অস্য (আত্মনঃ) রূপং সন্দৃশে (সম্যক দর্শন বিষয়ে) ন তিষ্ঠতি। অর্থাৎ আত্মার রূপ, দর্শনের বিষয় হয় না (অর্থাৎ তিনি দর্শনেন্দ্রিয় গোচর হইবার যোগ্য নহেন।

কশ্চনঃ এনম্ চক্ষুষা ন পশ্যতি (কেহ তাঁহাকে চর্ম্ম চক্ষু বা সাধারণ চক্ষু দ্বারা দেখিতে পায় না। জ্ঞান চক্ষু, বা তৃতীয় নেত্র বা সপ্তমেন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে পান)

হৃদা (হৃৎস্থয়া) মনীষা (সংশয় রহিতেন) মনসা (মনন রূপেন সম্যক দর্শনেন) [সঃ] অভিক্ ৯ প্তঃ (অভিপ্রকাশিতঃ [ভবতি]। অর্থাৎ হৃৎস্থিত সংশয় রহিত মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হন। যে এতৎ (এনম্ আত্মানং বিদুঃ, তে অমৃতাঃ ভবন্তি। যাঁহারা ইঁহাকে (আত্মাকে) জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

"যদা পঞ্চা বতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরা মিন্দ্রিয় ধারণাম্।
অপ্রমত্ত স্তদা ভবতি যোগোহি প্রভাব্যয়ৌ॥ ১০।১১

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, আর বুদ্ধি [নিজ বিষয়] চেষ্টা করেনা, তাহাকে (সেই অবস্থাকে)

[জ্ঞানিগণ] পরম গতি বলেন। সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে। তখন যোগী অপ্রমত্ত হয়েন ; যে হেতু যোগেরও উৎপত্তি আছে ও অপায় (নাশ) ও আছে, অতএব অপায় পরিহারের জন্য অপ্রমত্ত থাকা উচিত।

পাঠক! উপরি উক্ত শ্লোক ত্রয়ের অর্থ বিশ্লেষণ করিলে জানাযায়, (১ম) যে যোগসাধনে সিদ্ধি লাভে যত প্রকার বিঘ্ন আছে, তন্মধ্যে সংশয় অর্থাৎ সন্দেহই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। সংশয় রহিত মনন দ্বারা (আত্মা) প্রকাশিত হন।

২য়। "হৃৎস্থিত"—(হৃদয়) কাহাকে বলে। অনেকের ধারণা আছে যে মানব দেহের অভ্যন্তরে হৃদ্দেশ, ঠিক দুই ফুস্‌ফুসের মধ্য স্থানে পুলিপিঠার ন্যায় মাংস পিণ্ড। যেখানে অনাহত চক্রে বায়ু যন্ত্রে প্রাণ অধিষ্ঠিত আছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, হৃদয় আজ্ঞাচত্র হইতে মস্তিষ্ক মধ্যে অবস্থিত। যোগ শাস্ত্রের হৃদয় বলিতে কুট স্থান বা (ইংরাজিতে Pituta-ry body) বুঝায়। যে পর্য্যন্ত প্রাণ বায়ু সুষুম্নার বিবর মধ্যে অবস্থিত ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া বিচরণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ নাকরে, সে পর্য্যন্ত চিত্তের স্বাভাবিক বৃত্তি প্রবাহের নিবৃত্তি হয় না। যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং যোগ দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। সুতরাং চিত্ত স্থির করিবার উপায় প্রাণ সংরোধ।

(৩) যোগ কি ? যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, সেই স্থির ইন্দ্রিয় ধারণাকে যোগ বলে। যোগশাস্ত্র সেই জন্য বলেন যে—

"সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগো নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে"

যৎকালে মনুষ্য সর্ব্বচিন্তা পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তাঁহার সেই মনের লয় অবস্থাকে যোগ বলে। পাতঞ্জল ঋষি সেই কারণে বলিয়াছেন যে যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ।

যখন বুদ্ধি নিজ বিষয়ও চেষ্টা করে না, অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি সকলকে রুদ্ধ বা নিরোধ করার নাম যোগ। বাসনা জড়িত চিন্তাকে বৃত্তি বলে। চিত্তের এই বৃত্তি প্রবাহ জাগ্রত ও স্বপ্ন এই উভয় অবস্থাতে মানব হৃদয়ে সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছে। বাসনার একান্ত নাশ নাই। উহাকে দমন করা সুকঠিন। বাসনার বিশুদ্ধিকেই উহার নাশ বলে।

বাসনাকে শ্রীভগবানে সমর্পণ ভিন্ন অন্য উপায়ে উহার নাশ বা বিশুদ্ধি সম্ভবেনা। সুতরাং উহাকে দমন করা, উহার বহির্বিষয়ে প্রবাহিত হইবার প্রবৃত্তিকে নিবারণ করা এবং উহাকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষে, প্রণবধ্যান ও ষটচক্র ভেদ দ্বারা সহস্রারে লইয়া যাইয়া তাঁহাতে সমর্পণ করা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে সম্ভব নহে। কিরূপে প্রণবধ্যান ও ষটচক্র ভেদ করা যায় তাহার উপায় পরে বর্ণিত হইবে।

(৪র্থ) শরীরাভ্যন্তরে পঞ্চ ভূতের প্রত্যেকের অধিষ্ঠানের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থান আছে, ঐ স্থানগুলিকে চক্র বলে। তাহারা আপন আপন চক্রে অবস্থান করতঃ শারীরিক সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। গীতা একখানি যোগ শাস্ত্র। এই

গীতা শাস্ত্রে মহা যোগেশ্বর হরি অর্জ্জুনকে যোগ শাস্ত্র অর্থাৎ প্রাণায়াম ও ষটচক্র ভেদ ইত্যাদির উপদেশ দিয়াছেন। গীতা-অভ্যাস, ত্যাগী পুরুষ ভিন্ন অন্যপুরুষে সম্ভবেনা।

গুহ্যদেশে মূলাধার চক্রটী পৃথ্বী তত্ত্বের স্থান, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রটী জলতত্ত্বের স্থান, নাভিমূলে মণিপুর চক্রটী অগ্নি-তত্ত্বের স্থান, হৃদ্দেশে অনাহত চক্রটী বায়ু তত্ত্বের স্থান, কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশ তত্ত্বের স্থান। মোক্ষাভিলাষী যোগীগণ এই পাঁচটী চক্রে পৃথ্ব্যাদি তত্ত্বের বিষয়গুলি ধ্যান করিয়া ক্রমে ক্রমে সবই পরিত্যাগ করিয়া আজ্ঞা চক্রে যাইয়া মন স্থির করেন। ললাট দেশে আজ্ঞা নামক চক্রে পঞ্চতন্মাত্রাতত্ত্ব, ইন্দ্রিয় তত্ত্ব, চিত্ত ও মনের স্থান। তদূৰ্দ্ধে জ্ঞান নামক চক্রে অহং তত্ত্বের স্থান। তদূৰ্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে একটী শতদল পদ্ম বা চক্র আছে। তন্মধ্যে মহতত্ত্বের স্থান। তদূৰ্দ্ধে মহাশূন্যে সহস্র দল চক্রে প্রকৃতি পুরুষ রূপ পরমাত্মার স্থান। যোগীগণ পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে পরমাত্মা পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্ব অপ্রমত্ত্য ভাবে এই ভৌতিক দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন। অষ্ট সিদ্ধির জন্য চিন্তা করিলেই বিভূতি হয়, কিন্তু মোক্ষের অপায় বা নাশ হয়।

এক্ষণে কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। মূলাধার পদ্ম মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম নাড়ী মুখে স্বয়ম্ভু লিঙ্গ আছেন (বিশেষ বিবরণের জন্য ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ) তাঁহার গাত্রে দক্ষিণা-বর্ত্তে সাড়ে তিনবার বেষ্টন করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। এই কুলকুণ্ডলিনী শক্তিই জীবাত্মার প্রাণস্বরূপ বা জীবাত্মা।

যোগীরা বলেন ইনি ব্রহ্মনাড়ীর দ্বার রোধ করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্ম চিন্তন পরিত্যাগ করিয়া বিষয় সুখে আবদ্ধ আছেন। যাবৎ তিনি জাগরিত না হইবেন, তাবৎকাল, মন্ত্র, জপ, পূজা ও অর্চ্চনা বিফল।

যোগানুষ্ঠান দ্বারা কুণ্ডলিনীর চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিলেই মানব জীবনের পূর্ণত্ব। ভক্তিপূর্ণ চিত্তে প্রত্যহ কুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান পাঠে সাধকের ঐ শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে ও ঐ শক্তি ক্রমে ক্রমে উদ্বোধিত হইয়া থাকেন। ধ্যান যথা—ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধার নিবাসিনীং।

তামিষ্ট দেবতা রূপাং সার্দ্ধত্রি বলয়ান্বিতাং।

কোটী সৌদামিনী ভাসাং স্বয়ম্ভু লিঙ্গ বেষ্টিতাং॥

কুলকুণ্ডলিনী শক্তি উজ্জ্বল স্বর্ণ বর্ণ তেজ স্বরূপা দীপ্তিমতী। এই কুণ্ডলিনী শক্তিই ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া সর্ব্ব শরীরস্থ চক্রে চক্রে রমণ করেন। মনের মনন দ্বারা ইচ্ছা শক্তির আবির্ভাব হয়। প্রাণের গতি দ্বারা ক্রিয়া শক্তি কার্য্য করেন এবং বিজ্ঞানময় কোষের জ্ঞান শক্তি দ্বারা বহিস্থ ও অন্তরস্থঃ সমস্ত বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়।

প্রমাণ যথা ঃ—ঐতরেয়ো-পনিষৎ পঞ্চম খণ্ড ২য় শ্লোক

"যদেতৎ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নাম ধেয়ানি ভবন্তি॥" ২॥

যাহা প্রত্যেক বহিরিন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান লাভ করিতেছে, সেই এক মাত্র হৃদয় বা অন্তঃকরণই জীবাত্মা। বা কূটস্থ চৈতন্য। হৃদয় ও মন একই বস্তু। মনের বৃত্তি অনেক। সংজ্ঞান বা অহং জ্ঞান, আজ্ঞান বা ঈশ্বরত্ব জ্ঞান, বিজ্ঞান বা সর্ব্বকলা জ্ঞান, মেধা বা শাস্ত্রার্থ-ধারণা, দৃষ্টি বা ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান, ধৃতি বা দেহ ধারণ শক্তি, মতি বা মনন, মনীষা বা মনন স্বাতন্ত্র্য. (গীতার "যথেচ্ছসি তথা কুরু") জূতি বা রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি বা স্মরণ. সঙ্কল্প বা সঙ্কল্পন, ক্রতু বা অধ্যবসায়. অসু বা প্রাণন, কাম বা অভিলাষ, বশ বা স্ত্রীসঙ্গাভিলাষ, ইত্যাদি সমস্তই মনের বৃত্তি। উহারা প্রজ্ঞান অর্থাৎ শুদ্ধ আত্ম জ্ঞানেরই বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞামাত্র ॥ ২॥

হংস বা সোঽহং ঃ

মরা মরা বলে বাল্মীকী রাম নাম পেলো।
হংস হংস বলে জীব ওঁকারে মিলিল ॥

জীব সর্ব্বদা সোঽহংএর বিপরীত" হংস' ইতিমন্ত্রেণ" জীবাত্মাকে বা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সুষুম্না পথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। শ্বাস প্রশ্বাসে হংস উচ্চারিত হয়; অর্থাৎ শ্বাস বায়ুর নির্গমন সময়ে হং এবং গ্রহণ সময়ে সঃ এই শব্দ উচ্চারিত হয়। সংকারে গ্রহণ, ইহাই শক্তি স্বরূপা; হংকারে নির্গমন, ইহাই শিব স্বরূপ।

এই হংস শব্দকেই অজপা গায়ত্রী বলে। যতবার শ্বাস প্রশ্বাস হয়, ততবার "হংস" এই পরম মন্ত্র "অজপা" জপ হয়।

জীব এক অহোরাত্র মধ্যে ২১,৬০০ বার অজপা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। ইহাই মনুষ্যের স্বাভাবিক জপ এবং ইহাই জীবাত্মার অহোরাত্র সাধনা। হংসই জীবের জীবাত্মা। অহং ভাব আশ্রয় করিয়া এই জীবাত্মা মনুষ্য দেহে আছেন এবং সর্ব্ব প্রকার সুখ দুঃখাদি কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন। যোগ ক্রিয়ার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল হংসকে সোহহংএ পরিবর্ত্তন করা এবং তদ্দারা ওঁকারকে প্রাপ্ত হওয়া। এই হংস বিপরীত "সোহহং"ই সাধকের সাধনা। গুরু মুখে এই মহামন্ত্র শুনিলেই অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মন তাহা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারে। সুতরাং যোগাভ্যাস বা সাধনা অতি সহজ। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করিতে কোন কষ্ট নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যোগ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা কারেরা উহাকে এক ভয়ানক ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়া মানব মণ্ডলীকে এক মহামায়ায় মুহ্যমান করিয়া রাখিয়াছেন। জীবাত্মা সর্ব্বদাই এই "সোহহং অর্থাৎ "তিনিই আমি" এই শব্দ জপ করিয়া থাকেন এবং গুরুমুখে এই স্বতঃ উত্থিত হংস ও সোহহং অর্থ অবগত হইয়া এবং ঐ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রণবতত্ত্ব।

প্রণবের সম্যক তত্ত্ব প্রকাশ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ আছে। আমার বোধ হয় তাহার কারণ, অভক্ত, অবিশ্বাসী ও মূর্খ দিগের নিকট ইহা প্রকাশ করিলে কোন ফলোদয় হইবে না, বরঞ্চ যোগী দিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। এই ভয়েই শাস্ত্রকারেরা ইহাকে গুহ্য বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহার প্রমাণ আমি হাতে পাইয়াছি। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তক প্রকাশিত হইলে আমার কোন বন্ধু ঐ পুস্তক তাঁহার প্রতিবাসীগণের নিকট (যাঁহারা আমার পূর্ব্ব পরিচয় জানিতেন) পাঠ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন বলিয়া ছিলেন, আমরা দেখিতেছি যে গ্রন্থকার একজন ইঞ্জিনিয়র, রায় সাহেব, কুলীর সর্দ্দার; তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করা যায় না; কারণ তিনি বাগবাজারে বাস করিয়াছেন, সুতরাং এরূপ লেখা তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। মোট কথা বিশ্বাসই জ্ঞান লাভের প্রকৃত ক্ষেত্র। যাহা হউক আমি গুরু মুখে ও শাস্ত্রে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহার প্রকাশ করাই আমার এ গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্য এবং তাহাই এস্থলে বর্ণনা করিব। ইহাতে গুহ্য বিষয় কিছুই নাই ও হাস্যাস্পদ হইবার কিছুই নাই। যোগ জটিল বা গুহ্য বিষয় নহে। থিয়োডোলাইট ইত্যাদি যন্ত্র দ্বারা চন্দ্র সূর্য্য গেহণ পরিদর্শন, গ্রহ নক্ষত্রগণের স্থান নিরূপণ, ফনোগ্রাফে বা রেডিও

যোগে সঙ্গীত শ্রবণ ও টেলিগ্রাফে সংবাদ প্রেরণ যেমন বাহ্য বিজ্ঞানের কাজ, যোগও সেইরূপ অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের কাজ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি হংস বিপরীত "সোঽহং" হয়। কিন্তু স, আর হ লোপ হইলে কেবল ওঁ থাকে। ইহাই হৃদয়স্থ শব্দ ব্রহ্মরূপ ওঁকার বা প্রণব ধ্বনি। সাধকগণ শব্দ ব্রহ্মরূপ প্রণব ধ্বনি (ওঁকার) শ্রবণেচ্ছায় দ্বাদশ দল বিশিষ্ট অনাহত পদ্ম উর্দ্ধমুখ চিন্তা করিয়া গুরূপদেশ অনুসারে ক্রিয়া করিবেন, তাহা হইলে ওঁকারধ্বনি কর্ণগোচর হইবে। যোগী গুরু বলেন, এই শব্দ ব্রহ্মরূপ ওঁকার ব্যতীত আর একটী বর্ণ ব্রহ্মরূপ ওঁকার আছেন। তাহা আজ্ঞাচক্রোর্দ্ধে নিরালম্বপুরে নিত্য বিরাজিত। ভ্রূমধ্যে দ্বিদল বিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ আজ্ঞাচক্র (পিস্যুটারী দেহ ও পিনিয়ালগ্লাণ্ড) আছে। এই চক্রের উপরে যেস্থানে সুষুম্না ও শঙ্খিনী নাড়ী মিলিত হইয়াছে, সেই স্থানকে নিরালম্বপুরী বলে। তাহাই তারকব্রহ্ম স্থান। এই স্থানে ব্রহ্মনাড়ী আশ্রিত তারক বীজ প্রণব (ওঁকার) বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রণব বেদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মরূপ এবং শিব শক্তি যোগে প্রণবরূপ। শিব শব্দে হ-কার, তাহার আকার গজ কুম্ভের ন্যায় (হাতির মাথা) অর্থাৎ "ও" কার। ও-কার রূপ পর্য্যঙ্কে নাদ রূপিনী দেবী; তদুপরি বিন্দুরূপ পরমশিব। তাহা হইলেই ওঁকার হইল। সুতরাং শিব-শক্তি বা পুরুষ প্রকৃতির সমাযোগই ওঁকার। ওঁমীতীদং সর্ব্বং। সমস্ত জগৎই ওঁকারময়। তন্ত্রে এই ওঁকারের স্থূলমূর্ত্তি ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী বা রাজ-রাজেশ্বরী প্রভৃতি মহাবিদ্যা প্রকাশিত।

ওঁকার প্রণবের নামান্তর মাত্র। ওঁকারের তিন রূপ; শ্বেত, পীত ও লোহিত। অ, উ, ম যোগে প্রণব হইয়াছে। এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রণবে প্রতিষ্ঠিত আছে। অ-কার ব্রহ্মা উ-কার বিষ্ণু ও ম-কার মহেশ্বর। প্রণবে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণ, এবং ইচ্ছা শক্তি, ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞান শক্তি এই তিন শক্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্য ইহাকে ত্রয়ী বলা হয় এবং বেদকে ত্রয়ী বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণেরই ওঁকার জপ করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে আছে—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয় তে॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং এতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছসি তস্য তৎ॥

যে ব্রাহ্মণ প্রণব যুক্ত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রী জপে তিন প্রণব সংযুক্ত এবং ইষ্ট মন্ত্রের আদি ও অন্তে প্রণব দ্বারা সেতু বন্ধন না করিয়া জপ করিলে ইষ্ট মন্ত্র জপ বিফল। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীর আদি ও অন্তে দুই প্রণব যোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু ঐরূপ জপ নিস্ফল। গায়ত্রীর আদিতে ওঁকার, ব্যাহৃতির পর ওঁকার এবং গায়ত্রীর শেষে ওঁকার এই তিন স্থানে প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ করা কর্ত্তব্য॥

পূর্ব্বে বলিয়াছি অ, উ, ম রূপ পর্য্যঙ্কে নাদরূপিনী অর্দ্ধ মাত্রা ও তদুপরি বিন্দুতে ওঁ-কার হয়। সুতরাং প্রণবে পঞ্চ দেবতা

আছেন। প্রণবের ষোড়শ কলা আছে। প্রণব জপ করার পূর্ব্বে সেই ষোড়শ কলার পূজা করা কর্ত্তব্য। যথা শিরসি

১ ২ ৩ ৪
অং নমঃ, উং নমঃ, মং নমঃ, অর্দ্ধ-মাত্রায়ৈ বা নাদায়ৈ নমঃ,

৫ ৬ ৭ ৮
বিন্দবে নমঃ, কলায়ৈ নমঃ, কলাতীতায়ৈ নমঃ, শান্তায়ৈ নমঃ,

৯ ১০ ১১
শান্তাতীতায়ৈ নমঃ, উনন্মন্যৈ নমঃ, মনন্মন্যৈ নমঃ। (গুহ্যমূলে)

১২ ১৩ ১৪
পরায়ৈ নমঃ, (মণিপুরে বা নাভী মূলে) পশ্যন্তৈ নমঃ, অনাহত

১৫ ১৬
চক্রে মধ্যমায়ৈ নমঃ, এবং কণ্ঠে বৈখর্য্যৈ নমঃ। এইরূপে পূজা করিয়া উদারা স্বরে দীর্ঘ ঘণ্টা নিনাদবৎ ও অবিচ্ছন্ন তৈল ধারার ন্যায় "ওঁ" উচ্চারণ করিয়া নিরালম্ব পুরীতে সেই তেজোময় তারক ব্রহ্ম স্থানে ওঁকার বর্ত্তমান রহিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিতে হয়। সাধক যোগানুষ্ঠানে যথাবিধি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া নিরালম্ব পুরীতে আসিলে আত্মজ্যোতি রূপ ব্রহ্ম "ওঁকার" অথবা আপন আপন ইষ্ট দেবদেবীর দর্শন পান ও প্রকৃত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। সকল দেবদেবীর বীজ স্বরূপ বেদ প্রতি পাদ্য ব্রহ্ম রূপ প্রণবতত্ত্ব অবগত হইয়া সাধন করিলে এই তারক ব্রহ্ম স্থানে জ্যোতির্ম্ময় দেবদেবীর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।

প্রণবের উচ্চারণ ও তদর্থ চিন্তনই কর্ম্মযোগ এবং প্রাণকে আয়ত্ত করিবার উপায়।

ওঁমিতি ব্রহ্ম। ওঁমিতীদং সর্ব্বম্। তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বলিয়াছেন ওঁকার ব্রহ্ম। ওঁকার এই সমস্ত জগৎ। ওঁকার অনুকরণ সূচক বাক্য। শ্রোতা ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রবণ করাইতে বলিলে বক্তা শ্রবণ করাইয়া থাকেন। উদ্গাতা প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য নামক উদ্গান—কর্ত্তারা ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক সামগান করিয়া থাকেন। হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক ও গ্রাব স্তোতা নামক হোতৃ চতুষ্টর ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ঋক্ সকল উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিক অনুজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক হোমের অনুজ্ঞা প্রদান করা হয়। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হয়েন। ওঁকার উচ্চারণ পূর্ব্বক যিনি ব্রহ্ম প্রাপ্তির অভিলাষ করেন, তিনি ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বর্ণতত্ত্ব।

এক্ষণে মূলাধারাদি পদ্মের মাতৃকাবর্ণাত্মক দলের কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি।

(১ম) মূলাধার পদ্ম চতুদ্দল বিশিষ্ট, চতুর্দ্দল, ব, শ, ষ, স এই চারি বর্ণাত্মক। মূলাধার পদ্মের বিশেষ বিবরণে (যাহা পরে লিখিত হইয়াছে) দেখিতে পাইবেন, যে ঐ স্থানে পৃথ্বী বীজের মূর্ত্তি ঐরাবত পৃষ্ঠে ঐশ্চর্য্য দেবতা ইন্দ্রের ক্রোড়ে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখে বেদ উচ্চারণ করিতেছেন। সুতরাং উহাকে চতুর্দ্দল পদ্ম বলে। সাধক যখন ষটচক্র ভেদ করিবার চেষ্টা করিবেন,

তখন ঐ চতুর্দ্দলে জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভের জন্য চারি ভাগে বিভক্ত বেদের চিন্তা করিবেন। এইরূপ চিন্তা করিলে গন্ধ পদ্মাদি বাক্‌সিদ্ধি ও আরোগ্যাদি লাভ হয়।

(২য়) **স্বাধিষ্ঠান পদ্ম** বড় দল বিশিষ্ট; ষড়দলে- ব, ভ, ম, য, র, ল। এই ছয় মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে অবজ্ঞা, মূর্চ্ছা প্রশ্রয়, অবিশ্বাস, সর্ব্বনাশ ও ক্রূরতা এই ছয়টী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই পদ্মধ্যানে ভক্তি, আরোগ্য ও প্রভুত্বাদি সিদ্ধি হইয়া থাকে।

(৩য়) মণিপুর পদ্ম—দশদলযুক্ত, দশদল ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশ মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে, লজ্জা, পিশুনতা, ঈর্ষা, সুষুপ্তি বিষাদ, কষায়, তৃষ্ণা, মোহ, ঘৃণা ও ভয় এই দশটী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই পদ্ম ধ্যানে আরোগ্য ও ঐশ্চর্য্যাদি লাভ হয়।

(৪র্থ) অনাহত পদ্ম—দ্বাদশ দলযুক্ত—দ্বাদশ দল ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট ও ঠ। এই দ্বাদশ মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে আশা, চিন্তা, চেষ্টা, মমতা, দম্ভ, বিকলতা, বিবেক, অহঙ্কার, লোলতা, কপটতা, বিতর্ক ও অনুতাপ এই দ্বাদশটী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে অণিমাদি অষ্টেশ্চর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

(৫ম) বিশুদ্ধ পদ্ম—ষোড়শ দল বিশিষ্ট। ষোড়শ দল—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং অঃ এই ষোল মাতৃকা বর্ণাত্মক। প্রত্যেক দলে, নিষাদ, ঋষভ, গান্ধার ষড়জ, মধ্যম, ধৈবত ও পঞ্চম, এই সপ্ত স্বর, ওঁ হুং, ফট, বৌষট, বষট, স্বধা, স্বাহা, নমঃ, বিষ ও অমৃত এই ষোলটী বৃত্তি রহিয়াছে। সাধককে এই সকল বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এই বিশুদ্ধ পদ্ম ধ্যান করিলে জরা ও মৃত্যুপাশ নিবারণ করিবার ক্ষমতা লাভ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ। আজ্ঞা পদ্ম—দ্বিদল বিশিষ্ট—দুই দল—হ ও ক্ষ এই দুই মাতৃকা বর্ণাত্মক। এই পদ্মের কর্ণিকাভ্যন্তরে হ, ল্, ক্ষ ত্রিকোণ মণ্ডল আছে। ত্রিকোণের তিন কোণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ও বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন দেব আছেন। আজ্ঞা চক্রের উপরে ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীর মিলন স্থান। এই স্থানের নাম ত্রিকুট (পিনিয়াল গ্লাণ্ড ও পিটুটারী দেহ) এই ত্রিবেনীর উর্দ্ধে সুষুম্নার মুখে অর্দ্ধ চন্দ্রাকার মণ্ডল। ঐ অর্দ্ধ চন্দ্রের উর্দ্ধে তেজঃ পুঞ্জ স্বরূপ একটী বিন্দু আছে। এই স্থানে বায়ুর ক্রিয়া শেষ হইয়াছে। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে এই পর্য্যন্ত ক্রিয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সপ্তমেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া আরম্ভ। এই স্থান হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ধ্যানের ক্রিয়া। এই আজ্ঞা পদ্মের আর একটী নাম জ্ঞান পদ্ম। পরমাত্মা ইহার অধিষ্ঠাতা। এবং ইচ্ছা তাঁহার শক্তি। এই স্থানেই প্রদীপ্ত শিখা রূপিনী আত্মজোতি (যাহার বর্ণনা ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে বিশেষরূপে

ব্যাখ্যাত হইয়াছে) সুপীত স্বর্ণ রেণুর ন্যায় বা ইলেক্ট্রিক আলোকের ন্যায় বিরাজমান। এই স্থানে যে জ্যোতি দর্শন হয়, তাহাই সাধকের আত্ম প্রতিবিম্ব। এই পদ্ম ধ্যান করিলে দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন হয় এবং জগতের প্রত্যেক বিষয়ের জ্ঞান সম্পন্ন হয়।

৭ম। ললনা চক্র—তালু মূলে রক্তবর্ণ চোষট্টি দল বিশিষ্ট ললনা চক্রের অবস্থান। এই পদ্মে অহং তত্ত্বের স্থান। এখানে শ্রদ্ধা, সন্তোষ, স্নেহ, দম, মান, অপরাধ, শোক, খেদ, আরতি সম্ভ্রম, উর্ম্মি ও শুদ্ধতা এই দ্বাদশটী বৃত্তি এবং অমৃত আছে। এই পদ্ম ধ্যান করিলে উন্মাদ, জ্বর পিত্তাদিজনিত দাহ শূলাদি বেদনা এবং শিরঃপীড়া ও শরীরের জড়তা নষ্ট হয়।

৮ম। গুরুচক্র—ব্রহ্মরন্ধ্রে শ্বেতবর্ণ শতদল বিশিষ্ট এই অষ্টম পদ্ম আছে। এই শতদল পদ্মে হংস পিঠের উপরি গুরু পাদুকা এবং সকলেরই গুরু আছেন। ইনি অখণ্ড মণ্ডলাকারে চরাচর ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। এই পদ্মের মস্তকোপরি সহস্র দল পদ্মটী ছত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এই শত দল পদ্ম ধ্যান করিলে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ ও দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়।

নবম চক্র সহস্রার।

সহস্র দল কমল কর্ণিকাভ্যন্তরে ত্রিকোণ চন্দ্র-কোটী মণ্ডল আছে তাহার অন্য নাম শক্তি মণ্ডল। এই শক্তি মণ্ডল মধ্যে তেজোময় তুরীয় বা বিসর্গাকার মণ্ডল বিশেষ আছে। ইহাই সৃষ্টির উৎপত্তি স্থান। তদুপরি মধ্যাহ্ন কালীন কোটী সূর্য্য

কামক্ষেত্রের মধ্যস্থানে পরা প্রকৃতির অর্দ্ধ শক্তি, আর অপরা প্রকৃতির ত্রিগুণ শক্তির সম্মিলনে সার্দ্ধ ত্রি বলয়াকারে প্রাণাত্মা বা চিৎ-চৈতন্য বা স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ-বেষ্টিত জীবাত্মা, কুলকুণ্ডলিনীরূপে অবস্থিতা। এই জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ, জ্ঞান-জনিত ধ্যান ও বৈরাগ্যের ধর্ম্মে ঐ অষ্টপাশ উপেক্ষায়, বেদমাতা সাবিত্রী বা গায়ত্রীর স্মরণ হইলেই, অর্থাৎ অজপা হংসের গতি বিচ্ছেদে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই, কুলকুণ্ডলিনীর বেষ্টন খুলিয়া যায়, অর্থাৎ জীবাত্মা, অবিদ্যাজনিত কর্ম্ম সংস্কার রূপ পাশ বন্ধন কাটাইয়া মুক্ত বা চৈতন্য যুক্ত হইয়া, প্রাণাত্মার স্বধাম হৃদ্-পুণ্ডরিকে প্রণবাকারে গতি লাভ করেন। যথা স্থানে যথোল্লিখিত ভাবে আধার পদ্ম সহ কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিলে, সাধক সেই ধ্যান ফলে বৃহস্পতির ন্যায় সৎ পাণ্ডিত্য, অযত্ন লব্ধ নরেন্দ্রত্ব অর্থাৎ মনুষ্য সমাজে সম্মানার্হ এবং সর্ব্ববিদ্যা বিনোদিত্বের সহসা অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ তিনি নিরোগী হইয়া অহর্নিশি মহানন্দে শুদ্ধ ভাবে, কাব্য প্রবন্ধ বচনা দ্বারা, সুরগুরু (বৃহস্পতি) প্রভৃতি বুধগণকেও প্রীতিযুক্ত করেন।

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম।

লিঙ্গমূলে সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নার, এই স্বাধিষ্ঠান পদ্ম বা ভূবর্লোক। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির অপঞ্চীকৃত অপ্ স্তর। এই স্তরে ষড়-দল কমল। স্বয়ং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান হেতু, স্বাধিষ্ঠান নামে অভিহিত।

এই পদ্ম সিন্দুর-সদৃশ রক্তবর্ণ, ষড়্ দলে বিকসিত। এই ষড়্ দল ষড়্-রস বা শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের আশ্রয়। পরব্রহ্ম, শ্রীভগবানের চিজ্জ্যোতিরকণা জীব, পার্থিব ঐশ্বর্য্য উপেক্ষায়, অর্থাৎ মূলাধার চক্র ভেদে, সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহার উপরি উক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মাধুর্য্য শক্তির রস ধর্ম্মে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। এই ষড়্ দল বাদিলান্ত (বভমযরল) এই অক্ষর ষটক, অর্থাৎ উক্ত ষড়্ রস বা ঐশ্বর্য্যের অক্ষর (অবিনশ্বর) অবস্থা। এই পদ্মের বীজকোষ চতুর্দ্দার শোভিত ও ক্ষীরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, পরমার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায়, জীব ভগবৎ সাধনার অধিকার লাভ করে বলিয়াই ইহার চতুর্দ্দার। শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি সত্ত্বগুণাত্মক মহত্তত্ত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, ঐ সত্ত্বগুণ চন্দ্র মণ্ডলবৎ সুশুভ্র তোয় মণ্ডলে ক্ষীরোদ সমুদ্র স্বরূপে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখে। প্রকৃতি ও সত্ত্বাত্মক জ্ঞানদেবী ও ঐশ্বর্য্য দেবী (বাণী ও লক্ষ্মী রূপে)ঐ পুরুষের অঙ্ক শায়িনী হয়েন। ইনিই ব্যষ্টি জীব সমষ্টির, অন্তর্য্যামী, ক্ষীরোদ শায়ী বিষ্ণু বা নারায়ণ। তাই ইনি রস-ধর্ম্মী জীব সত্তা বাচক মকরারূঢ়। সাধনানুরাগে শ্রীগুরু কৃপায় মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা বা চৈতন্যময়ী হইলে, জীব বা সাধক কামজয়ে (আয়ত্বাধীনে) সত্ত্ব বা জ্ঞানাত্মক যে স্থিতি লাভ করেন, সেই স্থিতি শক্তি রাকিনী। এই শক্তি বলে সাধক, মায়া বা অবিদ্যা প্রসূতা সমস্ত বাধা বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া উত্তরোত্তর সাধনানুরাগ সম্পন্ন হয়েন, তাই রাকিনী দেবী নবঘনশ্যামরূপে নানা অস্ত্রে

উদ্যতাহস্তা। সাধনানুষ্ঠানে সাধকের জ্ঞানে এই ভাব প্রতিষ্ঠিতা হইলে, সাধকের সকল কুণ্ঠা বিগত হওয়ায় তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের অধিকারী করে। এই বৈকুণ্ঠের দক্ষভাগে শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারদাদি দেব বাঞ্ছিত, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের তুরীয় ধাম গোলক। এই পদ্মে ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের, অহং অভিমান সহ ষড় রিপুজয়ে (আয়ত্তাধীনে) বিগত মোহে, হৃদয়ে জ্ঞান সূর্য্য, নবোদিত দিবাকরের ন্যায় উদিত হয়, তাহাতে তিনি গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধাদি কাব্য রচনায় উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি লাভ করেন।

মণিপুর পদ্ম।

নাভিমূলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নার এই মণিপুর পদ্ম বা স্বঃলোক। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির তেজস্তত্ব। এই পদ্ম ডাদি ফান্ত (ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ,) দশাক্ষর শোভিত দশ দলে নীল বর্ণে বিকসিত। তেজের গুণ রূপ। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের দিব্য চিদ্বীর্য্য কণা প্রাণাত্মা, মায়াশ্রয়ে ব্যোম ও মরুৎ স্তর হইয়া তেজস্তত্ত্বে অনু প্রবিষ্ট হইলে, দশ দিঙমণ্ডলে দশধা সঞ্চারিত থাকিয়া প্রাণাত্মাসহ, রূপ প্রকৃতির ঐ আদিম অবস্থাই অবিনশ্বর অক্ষর ব্রহ্ম সত্তা ডাদি ফান্ত দশাক্ষর অবলম্বনে সমষ্টি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, বীজ মধ্যে বৃক্ষবৎ প্রসুপ্ত থাকেন। এইরূপ প্রকৃতি বা তেজস্তত্ত্বের শক্তি, ব্যষ্টি জীবদেহে নাভি মণ্ডল অবলম্বনে দশেন্দ্রিয় রূপে কার্য্য শীল হইতেছে। এই পদ্মের জীব কোষে তেজ বীজ "রং" স্বস্তিকাখ্য ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত। ঐ বীজদেবতা

মেষারুঢ় বৈশ্বানর। এক হস্তে ত্রিভুবনস্থ লোক সকলের বাঞ্ছিত ফলদান, ও অপর হস্তে অভয় এবং বর দান করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে রুদ্ররূপী মহাকালের অধিষ্ঠান। এই দেবতা-দ্বয়ের বাম পার্শ্বে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভূজা, পীতবাসে বিবিধাভরণ—ভূষিতা লাকিনী বা ভদ্র কালীরূপা যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। প্রাণাত্মার আশ্রয়ে স্থূল-দেহাশ্রিত জীবাত্মা, স্বস্তি-কাখ্য নিবৃত্তি ক্ষেত্রে, সংযম রূপা যোগিনী ভদ্রকালীর শক্তিতে, রূপ প্রকৃতি জয় করিতে পারিলেই তাহার ইন্দ্রিয় শক্তি স্থিতি লাভে, মৃত্যুরূপ মহাকাল তাহার ক্রোড়ীভূত হয়; অর্থাৎ মৃত্যু ইচ্ছাধীন হয়। আর প্রকৃতির রূপে বিমুগ্ধ জীবাত্মা, অজ্ঞানাচ্ছন্ন পশু—মেষের ন্যায় কাম ভোগ পরায়ণ হইলেও তাহার নাভিস্থিত ঐ বৈশ্বানর দেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস রূপ ক্ষয় মার্গে জন্ম মৃত্যু আবর্ত্তে, নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। ইহাই ঐ দেবতা বর্গের বিজ্ঞান রহস্য। এই মণি-পুরাখ্য নাভি পদ্মে বহ্নি বীজাত্মক বৈশ্বানর ও তৎ ক্রোড়স্থিত রুদ্র রূপী মহাকাল এবং যোগিনী দেবীকে ধ্যান করিলে, সেই ধ্যান ফলে সাধক সৃষ্টি, সংহার ও পালনে সমর্থ হয়েন। তাঁহার মুখ পদ্মে স্বরস্বতী বিরাজমানা থাকেন। তাহাতে তিনি জ্ঞান সম্পত্তি লাভ করেন।

অনাহত পদ্ম।

বক্ষস্থলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা মধ্যে অনাহত বা হৃৎপদ্ম বা মহর্লোক। সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির, অপঞ্চী-

কৃত সূক্ষ্ম মরুৎ স্তর। এই পদ্ম বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তাভ, হরিদ্বর্ণে দ্বাদশ দলে শোভিত। অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি এই দ্বাদশ স্পর্শ জ্ঞানাত্মক শক্তি সমন্বিত। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের জীব, ও জগদ্বীজ চিৎকণ-প্রাণ যতকাল তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না পারেন, ততকাল ব্রহ্মের, কাদি ঠান্ত (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট ও ঠ) এই দ্বাদশ অক্ষর মিশ্র বর্ণ প্রকৃতি অবলম্বনে, এই সূক্ষ্ম মরুৎ স্তরে প্রসুপ্ত থাকিয়া স্থূল হইতে স্থূলতর জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইতে থাকেন। এই হৃদ্ পদ্মকোষে সত্ত্ব প্রধান ত্রিগুণাত্মক ত্রিকোণ মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ বায়ু চক্র। ঐ চক্র মধ্যে বায়ু বীজ অক্ষর ব্রহ্ম "যং"। তাহার দেবতা শব্দাত্ম স্পার্শ-মুগ্ধ-মৃগ। ঐ মৃগাধিরূঢ় ঈশাণ নামক শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ শিব, অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক মুক্ত জীবাত্মা। তৎ ক্রোড়ে বাহু চতুষ্টয়ে, পাশ, কপাল, খট্বাঙ্গ ও অভয় ধারিনী, সুধা পান মত্তা পীতবর্ণা অনুভূতি দেবী কাকিনী বা ভুবনেশ্বরীর অবস্থিতি। ইনিই জীবের বিষয় জ্ঞানের স্মৃতির (অনুভব) উদ্বোধক, তাই গলে অস্থি মালা। ঐ ষট্‌কোণ ক্ষেত্রের উর্দ্ধে জ্ঞান-বৈরাগ্য দেবতা, অর্দ্ধ চন্দ্র বিভূষিত দ্বিভুজ বাণাখ্য শিব-লিঙ্গ। ইহাকেই হৃদয় গ্রন্থি বলে। এই হৃৎগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে, অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্যের বলে, প্রাণ-চৈতন্যের ধর্ম্মে, শ্রীভগবানে অথবা আপনাপন ইষ্ট দেবে ভক্তি অর্থাৎ অনুরাগ ভরে একান্ত শরণ লইলেই এই হৃৎগ্রন্থি ভেদ হয়। ঐ গ্রন্থি বা জ্ঞান সত্তার উপরেই অবিদ্যা আবরণ অর্থাৎ তোমার আত্মার

ত্রিপুটী শৃঙ্খল। এই অবিদ্যা বা ত্রিপুটীর অন্তরালেই অষ্ট সখী বা অষ্ট নায়িকা বেষ্টিত ঐ গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম। ইহাকেই হৃদ্ পুণ্ডরীক বা হৃদ্‌গুহা বলে। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এই গুহা মধ্যেই নিহিত। ঐ অষ্টনায়িকার বা অষ্ট সখীর সাহায্যে জীবাত্মা, ঐ হৃদ্‌গুহায় প্রবিষ্ট হইলে, হংস ভাব বা অবস্থা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ হংসাখ্য শ্বাস প্রশ্বাস, শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চার রূপ ক্রিয়া শক্তি বলে ইচ্ছা ও জ্ঞান শক্তিকে লইয়া মেরুদণ্ড মধ্যে পরাক্ষেত্র সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ গুরু প্রদত্ত মন্ত্র, ও গায়ত্র্যাদির অবলম্বনে উল্লিখিত ভাবে হৃদয় গুহায় প্রবেশ লাভ করে। ঐ স্থানে কল্পতরু মূলে মণি-পিঠোপরি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণ চৈতন্যে তন্ময় হইয়া তাঁহারি চিজ্জ্যোতি ধর্ম্মের দিব্য দৃষ্টিতে, সাধক, শ্রীভগবান বা আপনাপন অভিমত ইষ্ট দেবের দর্শনে কৃতকৃত্য হন। শ্রীগুরু প্রদত্ত শক্তি সঞ্চারের বলে এই হৃদ পদ্মে যে পরিমাণে তুমি ধ্যান নিষ্ঠ হইতে পারিবে, তোমার অরা (চিজ্জ্যোতি) সেই পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তোমাতে প্রাকৃতিক প্রিয় দর্শনতা জ্ঞানিগণাগ্রগণ্যতা, জিতেন্দ্রিয়তা, দূরদর্শিতা, দূরগ্রাহিতা ও লক্ষ্মীর অযাচিত কৃপাশ্রয়তা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে পরকায় প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবে।

বিশুদ্ধ পদ্ম।

কণ্ঠ স্থলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জামধ্যে এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম বা জন-লোক। এই স্থানে অব্যক্তা পরা প্রকৃতির ব্যোম-

তত্ত্ব-কার্য্যশীল। ব্যোমতত্ত্বে অন্য তত্ত্ব চতুষ্টয়ের সংশ্রব অভাবে নির্ম্মলত্ব বিধায় বিশুদ্ধাখ্য নামে অভিহিত। এই পদ্ম অত্যুজ্জ্বল ধূম্র-বর্ণ ষোড়শদলে শোভিত। শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য প্রাণ-চৈতন্য, মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্যোমতত্ত্বে আসিলে, ঐ ব্যোমের আশ্রয়ে অপর তত্ত্ব চতুষ্টয়ের সম্মীলনে পঞ্চীকৃত হইয়া আকাশ, অনিল, অনল, সলিল ও পৃথিবী নামে পঞ্চভূত পদার্থে পরিণত হয়। তখন প্রকৃতির ত্রিগুণ, পঞ্চভূত পদার্থে ক্রিয়া শীল হয়। তখন ঐ ত্রিগুণীকৃত পঞ্চভূত, পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বাত্মক প্রাণের সত্ত্বায় প্রকাশিত হইয়া পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব প্রকাশিত করে। তাই এইপদ্ম ষোড়শ দলে ষোড়শ স্বরবর্ণ অক্ষর ব্রহ্মসত্তায় বিকশিত। এই পদ্মের বীজকোষ মোহান্ধকার বিধ্বংশী চন্দ্র মণ্ডলে বেষ্টিত। তন্মধ্যে ব্যোমবীজ "হং" অধিষ্ঠিত। তাহার দেবতা শুক্লবর্ণ হস্তিপৃষ্ঠে পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন দশভুজ হর, তাঁহার ক্রোড়ে গৌরী, তদ্বামে চতুর্ভুজে পীতবর্ণা শাকিনী নাম্নী যোগিনী, ধনু, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন। ত্রিগুণাত্মক জীব ও জগৎ সহ দশদিক বিস্তৃত পঞ্চভূত, ব্যোমতত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া সংহার মূর্ত্তি হর, দশভুজে পঞ্চমুখে ত্রিনয়ন। মোহের প্রবলতায় পঞ্চত্ব বা মৃত্যু সংঘটন হয় বলিয়া, হর, হস্তি সমারুঢ়। শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চারে সাধক অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে শ্রীভগবানের জ্ঞান ও ভক্তি সম্পন্ন হইলে অজ্ঞান বিনাশেই ঐ জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করেন। তাই জ্ঞান যোগিনী ধনু, বাণ, পাশও অঙ্কুশ হস্তে ভক্তি দেবী গৌরীর পার্শ্বে

অবস্থিত। যে সাধক শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চারের বলে এই বিশুদ্ধ পদ্মে, মনসহ জীবনীশক্তি ও প্রাণ, ধ্যানবলে স্থির রাখিতে পারেন, তাঁহার ক্রোধে ত্রিভুবন বিচলিত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য এবং গণপতিও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারেন না। এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যান ফলে সাধক উত্তম কবিত্ব শক্তি এবং বক্তৃতা শক্তি লাভ করেন। সর্ব্বদা শান্তচিত্ত, সকলের হিতকারী, রোগ শোক বর্জ্জিত এবং চিরজীবী হইয়া জ্ঞান শক্তির ত্রিলোক দর্শনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

আজ্ঞাপদ্ম।

ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানের ঠিক সমসূত্রে সুষুম্নার অভ্যন্তরে এই দ্বিদল আজ্ঞাখ্য কমলের স্থান। মেরুদণ্ড অভ্যন্তরস্থিত মজ্জার সহিত যেস্থানে মস্তকমধ্যস্থ মস্তিকের সংযোগ সেই স্থানকে আজ্ঞাচক্র বলে। মস্তিষ্ক মধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্র দল কমল হইতে প্রাণ চৈতন্যের প্রবৃত্তি শক্তি এই আজ্ঞাচক্র হইতে নিয়মিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরস্থ সর্ব্বকেন্দ্র স্থানে আইসে বলিয়াই ইহার নাম আজ্ঞাচক্র। সুষুম্না এই আজ্ঞাচক্র হইতে দ্বিধাভূত হইয়া মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে এতদুভয় পথ দিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক শক্তি, আজ্ঞা চক্রে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শক্তিই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল। ব্রহ্মজ্যোতি প্রাণ চৈতন্যের চিন্তা শক্তি এই পদ্মাশয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ইহার বীজকোষ চিন্তামণিপুর নামে খ্যাত। স্থূল দেহের নব দ্বার পথে

অহংকার তত্ত্বাত্মক মনের ত্রিগুণাত্মক বিষয় ভোগ ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়। এজন্য ত্রিগুণাত্মক দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবস্থিতি। ঐ ক্ষেত্র মধ্যে পরমাত্মারূপীহংসের ক্রোড়ে সিদ্ধ কালিকা শক্তিসহ রূদ্রের অবস্থান। সাধন বলে পঞ্চভূত-প্রকৃতি জয়ে মূলাধারাদি বিশুদ্ধাখ্য চক্রভেদ করিতে পারিলেই পরা প্রকৃতি আদ্যামহাশক্তির কৃপায় কাল-বিজয় হয়। তাহাতেই ঐ সিদ্ধ কালী, রুদ্রাখ্য জীবাত্মার ক্রোড়গতা। এই চক্রে ষড় রিপুসহ মনের অবস্থান। তাই যোগিনী দেবী সম্মুখীন। এই চক্রের সাধনায় ষড় রিপু বিজিত হইলে প্রাণ প্রবাহ পরমাত্মা বিজড়িত প্রণবরূপে অবস্থিত হয়েন।

সহস্রদল পদ্ম।

সাধকের শিরদেশে অধোমুখ সহস্রদল কমল অবস্থিত, সহস্র অর্থে অনন্ত। অনাদি অনন্ত বিরাট জগতের মধ্য হইতে সাধকের প্রয়োজনানুযায়ী শক্তি ঐ অনন্ত হইতে আকৃষ্ট হইয়া সাধকের শিরদেশস্থ সহস্র দল কমলে সঞ্চারিত হয়। ঐ কমলের নিম্নে উর্দ্ধমুখ দ্বিদল আজ্ঞা কমলের অবস্থান। এই আজ্ঞাখ্য কমলের নাম মনস্তত্ত্বঃ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রধানশক্তি বশতঃ এই কমল দ্বিদলে বিকশিত। এই মনস্তত্ত্ব বা দ্বিদল আজ্ঞা কমলের উর্দ্ধে স্বর্ণ পীতাভ শ্বেতবর্ণ অষ্টদল অভ্যন্তরে দ্বাদশ দলের উপর শ্রীগুরুর আসন। যিনি ব্যষ্টিরূপে সাধকের এবং সমষ্টিরূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্য গর্ভতত্ত্ব স্বরূপে তমোগুণ উপকণ্ঠে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণাত্মক সুমহান মহতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

এবম্ভুত মহতত্বই ব্যষ্টি জীবদেহে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা ধীশক্তি। আর সমষ্টি বিরাটে পরম মঙ্গলময় শিব স্বরূপে বা গুরুরূপে অবস্থিত। এই সুমহান নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা ধীশক্তি বা শ্রীগুরুদেব, সাধকের কল্যাণেচ্ছু হইয়া সৎক্ষেত্রে রজোগুণ বা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধককে প্রদান করেন। সহস্রদল পদ্মের চারিদিকে পঞ্চাশ দল বিরাজিত এবং ঐ পঞ্চাশ দলে পঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণ আছে। সহস্রদল কমল কর্ণিকা অভ্যন্তরে ত্রিকোন চন্দ্র মণ্ডল আছে।

সপ্তমেন্দ্রিয় প্রাপ্তির জন্য সাধনা।

আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ক্রিয়া করবার কথা শেষ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রবন্ধে আজ্ঞার উপর উঠে জীব ঈশ্বর ও মায়া প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান আলোচনা করে কিরূপে সেই চরম সীমা "আমিতে" পৌঁছিতে হয় তাহাই বর্ণিত হইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোক আছে যে—

ইতিতে জ্ঞান মাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্য তরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদ শেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

এই শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হয় যে মানুষ প্রকৃতি পরতন্ত্র, স্বভাব পরতন্ত্র এবং ঈশ্বর পরতন্ত্র হ'লেও ইচ্ছাবিষয়ে মানবের স্বাতন্ত্র্য আছে। এই শক্তি থাকাতেই মনুষ্যের পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব।

গীতার নবম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন।

সমোহহং সর্ব্বভুতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্॥

আমি সর্ব্বজীবের পক্ষেই একরূপ ; আমার কেহ প্রিয় বা কেহ অপ্রিয় নাই। যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, সে ব্যক্তিকে আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। ভগবানের কাছে কেহ প্রিয়ও নহে, অপ্রিয়ও নহে। তিনি কর্ম্ম ফল বিধাতা।

সাধনার পরপর চারটী ক্রম আছে। প্রথম "মন্মনা ভব"। অর্থাৎ আমাতে বা কুটস্থ চৈতন্যে অথবা পিসুটারী দেহে, যেখানে ক্রমে মন ও বুদ্ধিকে একাগ্র করিয়া লইয়া আসিয়াছ, সেই স্থানে মনকে সম্পূর্ণ রূপে সংযত কর। দ্বিতীয় ক্রম "মদ্ভক্ত হও" অর্থাৎ একমাত্র আমাতে অনুরক্ত হও অর্থাৎ মনের আসক্তি একমাত্র কুটস্থে রাখ, অন্য কিছুতেই মন দিও না। তৃতীয় ক্রম "মদ্‌যাজী ভব"। অথাৎ মন্ত্র সহযোগে আমার পূজাকর। অর্থাৎ আমার যে মন্ত্র প্রণব, সেই প্রণব উচ্চারণ কর, সেই সঙ্গে আত্মা-মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ কর। তারপর চতুর্থ ক্রম "মাং নমস্কুরু"। কৃতাঞ্জলি পুটে শির বা মস্তক সংযুক্ত করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডবৎ নত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন ক্রমের পর আমার সমীপস্থ হ'য়ে আমাকে স্থির নেত্রে চেয়ে থেকে ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি যুক্ত কর। নিশ্চেষ্ট হও। এই ক্রিয়ায় দুই শক্তি (ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞান শক্তি) যখনই যুক্ত হবে, তখনই সাম্য ভাব আস্‌বে। ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় হবে, দৃশ্য থাকবে না। অভ্যাস পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত এই দর্শন, অদর্শন বারবার

হবে। ইহাই নমস্কার। ইহার শেষ ফল আমাতে এসে মিশে "আমি" হয়ে যাবে। "সোহহং" অবস্থা পাবে। এটী একেবারে ধ্রুব সত্য।

মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মনই মোক্ষের কারণ। আমি মনকে দুমুখো সর্পের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট মনে করি। কারণ মনকে আত্মদর্শনে লীন করা যায় এবং মনকে অতি নীচ কর্ম্মেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এইজন্য গীতা বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনু বিধীয়তে।

তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥

বিষয় বিলাসী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটী ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া যখন মন ধাবিত হয়, তখন জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকূল বায়ু যেমন বিচলিত করে, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রিয় সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করিয়া লয়।

যোগাভ্যাসকালে সাধকগণকে যোগের অষ্টাঙ্গের যে যম, নিয়মাদি সাধনার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা প্রতি পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ সংসারে গৃহী মাত্রেরই সেই সকল নিয়ম পালন করা অসম্ভব। তবে কি যোগ সাধনা হইবে না? হইবে; আসক্তি শূন্য হইয়া সকল কার্য্যই করা যাইতে পারে। আসক্তি শূন্য কার্য্যই শ্রেষ্ঠ। সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ অর্থ বিনা কোন সৎ কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনে আসক্তি বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। গীতাও বলিয়াছেন, যে,

যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।

সমঃ সিদ্ধা ব সিদ্ধৌ চ কৃত্বাঽপি ন নিবধ্যতে ॥

বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা না করিয়াও যাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ প্রার্থনা ও উদ্যম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন ; যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বের মধ্যেও স্থিরভাবে ব্রহ্মকে অনুভব করেন, এবং কার্য্যকালে ফল লাভ হইলে অথবা না হইলেও যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, তিনি কর্ম্ম করিলেও বন্ধন দশাগ্রস্ত হন না।

যেন সর্ব্বদা মনে থাকে,"আমি অকর্ত্তা"। সমস্তই ভগবানের, আমি নিমিত্ত মাত্র। তাঁহার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপনের জন্য আমাকে এই মর্ত্ত্য লোকে প্রেরণ করিয়াছেন। স্ত্রী পুত্র কন্যাদির প্রতি মায়াতেও ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ভগবান আমার উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণেব ভার অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার তাঁহার আদেশ প্রতি পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোন ভাবী সুখের আশা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ আশা করিলেই সংসারে আসক্তি আসিয়া নিজেকে দুঃখ ভাগী হইতে হইবে। সকল বিষয়েই বৈরাগ্যের আশ্রয় লইতে হইবে। সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগী হইতে হইবে। একাগ্র চিত্তে সহস্রারের বিন্দু ধরে থাকলেই মনের উপর আধিপত্য জন্মে এবং প্রাকৃতিক আবরণ আপনা আপনিই ক্ষয় হয়।

যোগীরা বলেন, আমরা যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা করি, চর্ম্ম চক্ষুর অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি

—অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ করতঃ সমুদায় দিদিক্ষা বৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাট অভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করি। তদ্বলে চিত্ত তখন একাগ্র হয় এবং ভৌতিক চক্ষুর সমুদায় শক্তি সেই একাগ্রীকৃত চিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। তখন আমরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভৌতিক চক্ষুর ও অন্যান্য ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমূহ আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদায় পুঞ্জীকৃত, কেন্দ্রীকৃত, বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি। এই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের চিত্ত-স্থান (ললাট অভ্যন্তরস্থ পিনিয়াল গ্লাণ্ড ও পিস্যুটারী দেহ) যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে অর্থাৎ এক প্রকার আশ্চর্য্য আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। তখন অন্তরাকাশ সহস্রগুণ জ্যোতির্ম্ময় হয়, সুবর্ণাচ্ছাদিত ভ্রামরী গুহা দৃষ্টি গোচর হয়। তার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি আপ্‌না আপ্নিই নিস্তেজ হয়ে যায়। সুতরাং সেই জ্যোতিতে আমরা পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত বা দিদৃক্ষিত বস্তু অবাধে দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রান্ত স্থানে যাইতে হয়না। তাহা আমরা এই ললাট মধ্যেই দেখিতে পাই। ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার জন্য আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই জ্যোতির্ম্ময়, আলোকময় বা প্রজ্ঞানময় সপ্তমেন্দ্রিয় বা তৃতীয় চক্ষুদ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট (বহু দূরস্থ) সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই।

এতাদৃশ তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ যোগ সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, বিবিধ অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক ও আধিভৌতিক ঘটনা অনুভূত হইতে থাকে। বিবিধ অমানুষ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে দেবদেবীর মুর্ত্তি, কখন দেবানু চর দিগের ছায়া, কখন ইষ্ট দেবতার প্রতিমুর্ত্তি, কখন দিব্য গন্ধ, কখন বা দিব্যবাণী (দৈববাণী) কখন বা দিব্য নিনাদ জ্ঞানস্থ হয়। দেহাভ্যন্তরে কখন ঝিল্লীরব, কখন ঘণ্টা নিনাদ কখন বংশিধ্বনি, কখন বীণার শব্দ, হৃদয়ে কখন ইষ্ট দেবতার বা উপাস্য দেবতার উদয়, ইত্যাদি বহু অলৌকিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত হইতে থাকে। সে সকল ব্যাপার সত্য? কি বিশ্বাসের ছলনা? তাহা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে সার উপদেশ এই যে, যখন দেখিবে, উক্ত প্রকার অলৌকিক বা অমানুষী কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তাহাকে সপ্ত- মেন্দ্রিয়ের অবতরণিকা বলিলে বলা যায়।

যোগীরা বলিয়া থাকেন, যে প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান দুইটী চক্ষু ব্যতীত আর একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। যোগীরা সেই জন্য যোগানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্যমান চক্ষুদ্বয় দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থূল বাহ্য বস্তু দর্শন হয় মাত্র; কোন সূক্ষ্ম বা আভ্যন্তরীণ বস্তু দর্শন হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু দ্বারা সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বস্তু দেখা যায়। যথা শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে—

অনাগত মতীতঞ্চ বর্ত্তমান মতীন্দ্রিয়ম্।

বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ॥

যোগীগণ, ভবিষ্যৎ, অতীত, বর্ত্তমান অতীন্দ্রিয় বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থিত) ও ব্যবহিত (ব্যবধান বিশিষ্ট অথাৎ দৃষ্টির অন্তরালে স্থিত) বিষয় সমূহ সম্যকরূপে দর্শন করিতে পারেন। সেই তৃতীয় চক্ষুর অন্য নাম দিব্য চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু ও সপ্তমেন্দ্রিয় বা সপ্তভূমি ইত্যাদি। সেই জ্ঞান চক্ষুর আশ্রয় ভ্রূসন্ধির উপরিস্থ ললাট ভাগের অভ্যন্তর। ললাট অভ্যন্তরে ঐরূপ তৃতীয় চক্ষু আছে, তাহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের ও শিবানীর ললাটে অন্য একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অঙ্কিত করি। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে প্রত্যেক মনুষ্যের যে ঐরূপ তৃতীয় চক্ষু আছে তাহা জানাইবার নিমিত্ত পিনিয়ালগ্লাণ্ড ও পিস্যুটারী বডী নামক দুইটী শারীরিক যন্ত্রের (যাহা কালক্রমে তৃতীয় চক্ষু নামে আবির্ভূত হইবে) চিত্র দিয়াছি (... চিত্র দেখ) যদ্বারা পদার্থ সকলের অভ্যন্তরস্থ বিভাগের বি... যোগীরা দেখিতে পান।

পাঠক! যদি তুমিও ... যোগী হও ও জ্ঞানী হও, তোমারও তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

তখনই জানিবে তোমার সিদ্ধি অদূরে। সুতরাং সেই সকল অমানুষী বা অলৌকিক আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন বা সন্দর্শন করিয়া ভীত হইও না। মুগ্ধও হইও না। সে সকল ঘটনাকে জাগ্রৎ স্বপ্ন বা জাগ্রৎ ভ্রম মনে করিও না। বরং দৃঢ়তা সহকারে সমধিক উৎসাহী, সমধিক আনন্দিত ও যোগ বলের প্রতি

কামক্ষেত্রের মধ্যস্থানে পরা প্রকৃতির অর্দ্ধ শক্তি, আর অপরা প্রকৃতির ত্রিগুণ শক্তির সম্মিলনে সার্দ্ধ ত্রি বলয়াকারে প্রাণাত্মা বা চিৎ-চৈতন্য বা স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ-বেষ্টিত জীবাত্মা, কুলকুণ্ডলিনীরূপে অবস্থিতা। এই জীবাত্মা বা কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ, জ্ঞান-জনিত ধ্যান ও বৈরাগ্যের ধর্ম্মে ঐ অষ্টপাশ উপেক্ষায়, বেদমাতা সাবিত্রী বা গায়ত্রীর স্মরণ হইলেই, অর্থাৎ অজপা হংসের গতি বিচ্ছেদে প্রাণায়াম অভ্যাস করিলেই, কুলকুণ্ডলিনীর বেষ্টন খুলিয়া যায়, অর্থাৎ জীবাত্মা, অবিদ্যাজনিত কর্ম্ম সংস্কার রূপ পাশ বন্ধন কাটাইয়া মুক্ত বা চৈতন্য যুক্ত হইয়া, প্রাণাত্মার স্বধাম হৃদ্-পুণ্ডরিকে প্রণবাকারে গতি লাভ করেন। যথা স্থানে যথোল্লিখিত ভাবে আধার পদ্ম সহ কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিলে, সাধক সেই ধ্যান ফলে বৃহস্পতির ন্যায় সৎ পাণ্ডিত্য, অযত্ন লব্ধ নরেন্দ্রত্ব অর্থাৎ মনুষ্য সমাজে সম্মানার্হ এবং সর্ব্ববিদ্যা বিনোদিত্বের সহসা অধিকার প্রাপ্ত হয়েন। অপিচ তিনি নিরোগী হইয়া অহর্নিশি মহানন্দে শুদ্ধ ভাবে, কাব্য প্রবন্ধ বচনা দ্বারা, সূরগুরু (বৃহস্পতি) প্রভৃতি বুধগণকেও প্রীতিযুক্ত করেন।

স্বাধিষ্ঠান পদ্ম।

লিঙ্গমূলে সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নার, এই স্বাধিষ্ঠান পদ্ম বা ভূবর্লোক। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির অপঞ্চীকৃত অপ্ স্তর। এই স্তরে ষড়-দল কমল। স্বয়ং শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান হেতু, স্বাধিষ্ঠান নামে অভিহিত।

এই পদ্ম সিন্দুর-সদৃশ রক্তবর্ণ, ষড়্ দলে বিকসিত। এই ষড়্ দল ষড়্-রস বা শ্রীভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যের আশ্রয়। পরব্রহ্ম, শ্রীভগবানের চিজ্জ্যোতিরকণা জীব, পার্থিব ঐশ্বর্য্য উপেক্ষায়, অর্থাৎ মূলাধার চক্র ভেদে, সর্ব্ব প্রথমেই তাঁহার উপরি উক্ত ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ মাধুর্য্য শক্তির রস ধর্ম্মে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। এই ষড়্ দল বাদিলান্ত (বভমযরল) এই অক্ষর ষটক, অর্থাৎ উক্ত ষড়্ রস বা ঐশ্বর্য্যের অক্ষর (অবিনশ্বর) অবস্থা। এই পদ্মের বীজকোষ চতুর্দ্দার শোভিত ও ক্ষীরোদ সমুদ্রে বেষ্টিত। আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, পরমার্থী ও জ্ঞানী এই চতুর্ব্বিধ অবস্থায়, জীব ভগবৎ সাধনার অধিকার লাভ করে বলিয়াই ইহার চতুর্দ্দার। শ্রীভগবানের ক্রিয়াশক্তি সত্ত্বগুণাত্মক মহত্তত্বে অনুপ্রবিষ্ট হইলে, ঐ সত্ত্বগুণ চন্দ্র মণ্ডলবৎ সুশুভ্র তোয় মণ্ডলে ক্ষীরোদ সমুদ্র স্বরূপে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রাখে। প্রকৃতি ও সত্ত্বাত্মক জ্ঞানদেবী ও ঐশ্বর্য্য দেবী (বাণী ও লক্ষ্মী রূপে)ঐ পুরুষের অঙ্ক শায়িনী হয়েন। ইনিই ব্যষ্টি জীব সমষ্টির, অন্তর্য্যামী, ক্ষীরোদ শায়ী বিষ্ণু বা নারায়ণ। তাই ইনি রস-ধর্ম্মী জীব সত্তা বাচক মকরারূঢ়। সাধনানুরাগে শ্রীগুরু কৃপায় মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা বা চৈতন্যময়ী হইলে, জীব বা সাধক কামজয়ে (আত্মস্বাধীনে) সত্ত্ব বা জ্ঞানাত্মক যে স্থিতি লাভ করেন, সেই স্থিতি শক্তি রাকিনী। এই শক্তি বলে সাধক, মায়া বা অবিদ্যা প্রসূতা সমস্ত বাধা বিঘ্ন খণ্ডন করিয়া উত্তরোত্তর সাধনানুরাগ সম্পন্ন হয়েন, তাই রাকিনী দেবী নবঘনশ্যামরূপে নানা অস্ত্রে

উম্মতাহস্তা। সাধনানুষ্ঠানে সাধকের জ্ঞানে এই ভাব প্রতিষ্ঠিতা হইলে, সাধকের সকল কুণ্ঠা বিগত হওয়ায় তাঁহাকে বৈকুণ্ঠের অধিকারী করে। এই বৈকুণ্ঠের দক্ষভাগে শিব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারদাদি দেব বাঞ্ছিত, পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের তুরীয় ধাম গোলক। এই পদ্মে ধ্যান প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের, অহং অভিমান সহ ষড় রিপুজয়ে (আয়ত্তাধীনে) বিগত মোহে, হৃদয়ে জ্ঞান সূর্য্য, নবোদিত দিবাকরের ন্যায় উদিত হয়, তাহাতে তিনি গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধাদি কাব্য রচনায় উৎকৃষ্ট কবিত্ব শক্তি লাভ করেন।

মণিপুর পদ্ম।

নাভিমূলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা অভ্যন্তরে সুষুম্নার এই মণিপুর পদ্ম বা স্বঃলোক। ইহা সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির তেজস্তত্ত্ব। এই পদ্ম ডাদি ফান্ত (ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ,) দশাক্ষর শোভিত দশ দলে নীল বর্ণে বিকসিত। তেজের গুণ রূপ। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের দিব্য চিদ্বীর্য্য কণা প্রাণাত্মা, মায়াশ্রয়ে ব্যোম ও মরুৎ স্তর হইয়া তেজস্তত্ত্বে অনু প্রবিষ্ট হইলে, দশ দিঙমণ্ডলে দশধা সঞ্চারিত থাকিয়া প্রাণাত্মাসহ, রূপ প্রকৃতির ঐ আদিম অবস্থাই অবিনশ্বর অক্ষর ব্রহ্ম সত্তা ডাদি ফান্ত দশাক্ষর অবলম্বনে সমষ্টি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে, বীজ মধ্যে বৃক্ষবৎ প্রসুপ্ত থাকেন। এইরূপ প্রকৃতি বা তেজস্তত্ত্বের শক্তি, ব্যষ্টি জীবদেহে নাভি মণ্ডল অবলম্বনে দশেন্দ্রিয় রূপে কার্য্য শীল হইতেছে। এই পদ্মের জীব কোষে তেজ বীজ "রং" স্বস্তিকাখ্য ক্ষেত্র মধ্যে অবস্থিত। ঐ বীজদেবতা

মেষারূঢ় বৈশ্বানর। এক হস্তে ত্রিভুবনস্থ লোক সকলের বাঞ্ছিত ফলদান, ও অপর হস্তে অভয় এবং বর দান করিতেছেন। তাঁহার ক্রোড়ে রুদ্ররূপী মহাকালের অধিষ্ঠান। এই দেবতা-দ্বয়ের বাম পার্শ্বে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভূজা, পীতবাসে বিবিধাভরণ—ভূষিতা লাকিনী বা ভদ্র কালীরূপা যোগিনী দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন। প্রাণাত্মার আশ্রয়ে স্থূল-দেহাশ্রিত জীবাত্মা, স্বস্তি-কাখ্য নিবৃত্তি ক্ষেত্রে, সংযম রূপা যোগিনী ভদ্রকালীর শক্তিতে, রূপ প্রকৃতি জয় করিতে পারিলেই তাহার ইন্দ্রিয় শক্তি স্থিতি লাভে, মৃত্যুরূপ মহাকাল তাহার ক্রোড়ীভূত হয়; অর্থাৎ মৃত্যু ইচ্ছাধীন হয়। আর প্রকৃতির রূপে বিমুগ্ধ জীবাত্মা, অজ্ঞানাচ্ছন্ন পশু—মেষের ন্যায় কাম ভোগ পরায়ণ হইলেও তাহার নাভিস্থিত ঐ বৈশ্বানর দেবতার আশ্রয়ে আশ্রিত থাকিয়া, শ্বাস প্রশ্বাস রূপ ক্ষয় মার্গে জন্ম মৃত্যু আবর্ত্তে, নিজকৃত কর্ম্মফল ভোগ করিতে থাকে। ইহাই ঐ দেবতা বর্গের বিজ্ঞান রহস্য। এই মণি-পুরাখ্য নাভি পদ্মে বহ্নি বীজাত্মক বৈশ্যানর ও তৎ ক্রোড়স্থিত রুদ্র রূপী মহাকাল এবং যোগিনী দেবীকে ধ্যান করিলে, সেই ধ্যান ফলে সাধক সৃষ্টি, সংহার ও পালনে সমর্থ হয়েন। তাঁহার মুখ পদ্মে স্বরস্বতী বিরাজমানা থাকেন। তাহাতে তিনি জ্ঞান সম্পত্তি লাভ করেন।

অনাহত পদ্ম।

বক্ষস্থলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জা মধ্যে অনাহত বা হৃৎপদ্ম বা মহর্লোক। সাম্যা অব্যক্তা পরা প্রকৃতির, অপঞ্চী-

কৃত সূক্ষ্ম মরুৎ স্তর। এই পদ্ম বন্ধুক পুষ্পের ন্যায় রক্তাভ-হরিদ্বর্ণে দ্বাদশ দলে শোভিত। অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধি এই দ্বাদশ স্পর্শ জ্ঞানাত্মক শক্তি সমন্বিত। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের জীব, ও জগদ্বীজ চিৎকণ-প্রাণ যতকাল তাঁহার সহিত মিলিত হইতে না পারেন, ততকাল ব্রহ্মের, কাদি ঠান্ত (ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট ও ঠ) এই দ্বাদশ অক্ষর মিশ্র বর্ণ প্রকৃতি অবলম্বনে, এই সূক্ষ্ম মরুৎ স্তরে প্রসুপ্ত থাকিয়া স্থূল হইতে স্থূলতর জীব ও জগদ্রূপে পরিণত হইতে থাকেন। এই হৃদ্ পদ্মকোষে সত্ত্ব প্রধান ত্রিগুণাত্মক ত্রিকোণ মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণ বায়ু চক্র। ঐ চক্র মধ্যে বায়ু বীজ অক্ষর ব্রহ্ম "যং"। তাহার দেবতা শব্দাত্ম স্পর্শ-মুগ্ধ-মৃগ। ঐ মৃগাধিরুঢ় ঈশাণ নামক শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ শিব, অর্থাৎ শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক মুক্ত জীবাত্মা। তৎ ক্রোড়ে বাহু চতুষ্টয়ে, পাশ, কপাল, খট্বাঙ্গ ও অভয় ধারিনী, সুধা পান মত্তা পীতবর্ণা অনুভূতি দেবী কাকিনী বা ভুবনেশ্বরীর অবস্থিতি। ইনিই জীবের বিষয় জ্ঞানের স্মৃতির (অনুভব) উদ্বোধক, তাই গলে অস্থি মালা। ঐ ষট্‌কোণ ক্ষেত্রের উর্দ্ধে জ্ঞান-বৈরাগ্য দেবতা, অর্দ্ধ চন্দ্র বিভূষিত দ্বিভুজ বাণাখ্য শিব-লিঙ্গ। ইহাকেই হৃদয় গ্রন্থি বলে। এই হৃৎগ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলে, অর্থাৎ জ্ঞান বৈরাগ্যের বলে, প্রাণ-চৈতন্যের ধর্ম্মে, শ্রীভগবানে অথবা আপনাপন ইষ্ট দেবে ভক্তি অথাৎ অনুরাগ ভরে একান্ত শরণ লইলেই এই হৃৎগ্রন্থি ভেদ হয়। ঐ গ্রন্থি বা জ্ঞান সত্তার উপরেই অবিদ্যা আবরণ অর্থাৎ তোমার আত্মার

ত্রিপুটী শৃঙ্খল। এই অবিদ্যা বা ত্রিপুটীর অন্তরালেই অষ্ট সখী বা অষ্ট নায়িকা বেষ্টিত ঐ গুপ্ত অষ্টদল পদ্ম। ইহাকেই হৃদ্ পুণ্ডরীক বা হৃদ্‌গুহা বলে। ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব এই গুহা মধ্যেই নিহিত। ঐ অষ্টনায়িকার বা অষ্ট সখীর সাহায্যে জীবাত্মা, ঐ হৃদ্‌গুহায় প্রবিষ্ট হইলে, হংস ভাব বা অবস্থা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ হংসাখ্য শ্বাস প্রশ্বাস, শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চার রূপ ক্রিয়া শক্তি বলে ইচ্ছা ও জ্ঞান শক্তিকে লইয়া মেরুদণ্ড মধ্যে পরাক্ষেত্র সুষুম্নায় প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ গুরু প্রদত্ত মন্ত্র, ও গায়ত্র্যাদির অবলম্বনে উল্লিখিত ভাবে হৃদয় গুহায় প্রবেশ লাভ করে। ঐ স্থানে কল্পতরু মূলে মণি-পিঠোপরি অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত দীপ কলিকাকার প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণ চৈতন্যে তন্ময় হইয়া তাঁহারি চিজ্জ্যোতি ধর্ম্মের দিব্য দৃষ্টিতে, সাধক, শ্রীভগবান বা আপনাপন অভিমত ইষ্ট দেবের দর্শনে কৃতকৃত্য হন। শ্রীগুরু প্রদত্ত শক্তি সঞ্চারের বলে এই হৃদ পদ্মে যে পরিমাণে তুমি ধ্যান নিষ্ঠ হইতে পারিবে, তোমার অরা (চিজ্জ্যোতি) সেই পরিমাণে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া তোমাতে প্রাকৃতিক প্রিয় দর্শনতা জ্ঞানিগণাগ্রগণ্যতা, জিতেন্দ্রিয়তা, দূরদর্শিতা, দূরগ্রাহিতা ও লক্ষ্মীর অযাচিত কৃপাশ্রয়তা প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীর অবলম্বনে পরকায় প্রবেশাধিকার পর্য্যন্ত প্রকাশ করিবে।

বিশুদ্ধ পদ্ম।

কণ্ঠ স্থলের সমসূত্রে মেরুদণ্ডের মজ্জামধ্যে এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্ম বা জন-লোক। এই স্থানে অব্যক্তা পরা প্রকৃতির ব্যোম-

তত্ত্ব-কার্য্যশীল। ব্যোমতত্ত্বে অন্য তত্ত্ব চতুষ্টয়ের সংশ্রব অভাবে নির্ম্মলত্ব বিধায় বিশুদ্ধাখ্য নামে অভিহিত। এই পদ্ম অত্যুজ্জ্বল ধূম্র-বর্ণ ষোড়শদলে শোভিত। শ্রীভগবানের চিদ্বীর্য্য প্রাণ-চৈতন্য, মায়া প্রকৃতির আশ্রয়ে ব্যোমতত্ত্বে আসিলে, ঐ ব্যোমের আশ্রয়ে অপর তত্ত্ব চতুষ্টয়ের সম্মীলনে পঞ্চীকৃত হইয়া আকাশ, অনিল, অনল, সলিল ও পৃথিবী নামে পঞ্চভূত পদার্থে পরিণত হয়। তখন প্রকৃতির ত্রিগুণ, পঞ্চভূত পদার্থে ক্রিয়া শীল হয়। তখন ঐ ত্রিগুণীকৃত পঞ্চভূত, পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্বাত্মক প্রাণের সত্ত্বায় প্রকাশিত হইয়া পঞ্চভূতাত্মক বিশ্ব প্রকাশিত করে। তাই এইপদ্ম ষোড়শ দলে ষোড়শ স্বরবর্ণ অক্ষর ব্রহ্মসত্তায় বিকশিত। এই পদ্মের বীজকোষ মোহান্ধকার বিধ্বংশী চন্দ্র মণ্ডলে বেষ্টিত। তন্মধ্যে ব্যোমবীজ "হং" অধিষ্ঠিত। তাহার দেবতা শুক্লবর্ণ হস্তিপৃষ্ঠে পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন দশভুজ হর, তাঁহার ক্রোড়ে গৌরী, তদ্বামে চতুর্ভুজে পীতবর্ণা শাকিনী নাম্নী যোগিণী, ধনু, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন। ত্রিগুণাত্মক জীব ও জগৎ সহ দশদিক বিস্তৃত পঞ্চভূত, ব্যোমতত্ত্বে বিলয় প্রাপ্ত হয় বলিয়া সংহার মূর্ত্তি হর, দশভুজে পঞ্চমুখে ত্রিনয়ন। মোহের প্রবলতায় পঞ্চত্ব বা মৃত্যু সংঘটন হয় বলিয়া, হর, হস্তি সমারূঢ়। শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চারে সাধক অভ্যাস ও বৈরাগ্যবলে শ্রীভগবানের জ্ঞান ও ভক্তি সম্পন্ন হইলে অজ্ঞান বিনাশেই ঐ জ্ঞান ও ভক্তি লাভ করেন। তাই জ্ঞান যোগিনী ধনু, বাণ, পাশও অঙ্কুশ হস্তে ভক্তি দেবী গৌরীর পার্শ্বে

অবস্থিত। যে সাধক শ্রীগুরু কৃপালব্ধ শক্তি সঞ্চারের বলে এই বিশুদ্ধ পদ্মে, মনসহ জীবনীশক্তি ও প্রাণ, ধ্যানবলে স্থির রাখিতে পারেন, তাঁহার ক্রোধে ত্রিভুবন বিচলিত হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সূর্য্য এবং গণপতিও তাঁহাকে নিবারণ করিতে পারেন না। এই বিশুদ্ধাখ্য পদ্মের ধ্যান ফলে সাধক উত্তম কবিত্ব শক্তি এবং বক্তৃতা শক্তি লাভ করেন। সর্ব্বদা শান্তচিত্ত, সকলের হিতকারী, রোগ শোক বর্জ্জিত এবং চিরজীবী হইয়া জ্ঞান শক্তির ত্রিলোক দর্শনের ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

আজ্ঞাপদ্ম।

ভ্রূযুগলের মধ্যস্থানের ঠিক সমসূত্রে সুষুম্নার অভ্যন্তরে এই দ্বিদল আজ্ঞাখ্য কমলের স্থান। মেরুদণ্ড অভ্যন্তরস্থিত মজ্জার সহিত যেস্থানে মস্তকমধ্যস্থ মস্তিকের সংযোগ সেই স্থানকে আজ্ঞাচক্র বলে। মস্তিষ্ক মধ্যস্থ ব্রহ্মরন্ধ্র বা সহস্র দল কমল হইতে প্রাণ চৈতন্যের প্রবৃত্তি শক্তি এই আজ্ঞাচক্র হইতে নিয়মিত হইয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরস্থ সর্ব্বকেন্দ্র স্থানে আইসে বলিয়াই ইহার নাম আজ্ঞাচক্র। সুষুম্না এই আজ্ঞাচক্র হইতে দ্বিধাভূত হইয়া মস্তকের সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়াছে। ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে এতদুভয় পথ দিয়া প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মূলক শক্তি, আজ্ঞা চক্রে আসিয়া প্রবিষ্ট হয়। এই প্রবৃত্তি নিবৃত্তি শক্তিই আজ্ঞাচক্রের দ্বিদল। ব্রহ্মজ্যোতি প্রাণ চৈতন্যের চিন্তা শক্তি এই পদ্মাশয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ইহার বীজকোষ চিন্তামণিপুর নামে খ্যাত। স্থূল দেহের নব দ্বার পথে

অহংকার তত্ত্বাত্মক মনের ত্রিগুণাত্মক বিষয় ভোগ ব্যাপাব নিষ্পন্ন হয়। এজন্য ত্রিগুণাত্মক দেবতা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের অবস্থিতি। ঐ ক্ষেত্র মধ্যে পরমাত্মারূপীহংসের ক্রোড়ে সিদ্ধ কালিকা শক্তিসহ রুদ্রের অবস্থান। সাধন বলে পঞ্চভূত-প্রকৃতি জয়ে মূলাধারাদি বিশুদ্ধাখ্য চক্রভেদ করিতে পারিলেই পরা প্রকৃতি আদ্যামহাশক্তির কৃপায় কাল-বিজয় হয়। তাহাতেই ঐ সিদ্ধ কালী, রুদ্রাখ্য জীবাত্মার ক্রোড়গতা। এই চক্রে ষড় রিপুসহ মনের অবস্থান। তাই যোগিনী দেবী সম্মুখীন। এই চক্রের সাধনায় ষড় রিপু বিজিত হইলে প্রাণ প্রবাহ পরমাত্মা বিজড়িত প্রণবরূপে অবস্থিত হয়েন।

সহস্রদল পদ্ম।

সাধকের শিরদেশে অধোমুখ সহস্রদল কমল অবস্থিত, সহস্র অর্থে অনন্ত। অনাদি অনন্ত বিরাট জগতের মধ্য হইতে সাধকের প্রয়োজনানুযায়ী শক্তি ঐ অনন্ত হইতে আকৃষ্ট হইয়া সাধকের শিরদেশস্থ সহস্র দল কমলে সঞ্চারিত হয়। ঐ কমলের নিম্নে ঊর্দ্ধমুখ দ্বিদল আজ্ঞা কমলের অবস্থান। এই আজ্ঞাখ্য কমলের নাম মনস্তত্ত্বঃ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি প্রধানশক্তি বশতঃ এই কমল দ্বিদলে বিকশিত। এই মনস্তত্ত্ব বা দ্বিদল আজ্ঞা কমলের ঊর্দ্ধে স্বর্ণ পীতাভ শ্বেতবর্ণ অষ্টদল অভ্যন্তরে দ্বাদশ দলের উপর শ্রীগুরুর আসন। যিনি ব্যষ্টিরূপে সাধকের এবং সমষ্টিরূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে হিরণ্য গর্ভতত্ত্ব স্বরূপে তমোগুণ উপকণ্ঠে বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণাত্মক সুমহান মহতত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠিত।

এবম্ভুত মহতত্ত্বই ব্যষ্টি জীবদেহে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা ধীশক্তি। আর সমষ্টি বিরাটে পরম মঙ্গলময় শিব স্বরূপে বা গুরুরূপে অবস্থিত। এই সুমহান নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বা ধীশক্তি বা শ্রীগুরুদেব, সাধকের কল্যাণেচ্ছু হইয়া সংক্ষেত্রে রজোগুণ বা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ববিধ মঙ্গল সাধককে প্রদান করেন। সহস্রদল পদ্মের চারিদিকে পঞ্চাশ দল বিরাজিত এবং ঐ পঞ্চাশ দলে পঞ্চাশ মাতৃকাবর্ণ আছে। সহস্রদল কমল কর্ণিকা অভ্যন্তরে ত্রিকোন চন্দ্র মণ্ডল আছে।

সপ্তমেন্দ্রিয় প্রাপ্তির জন্য সাধনা।

আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত ক্রিয়া করবার কথা শেষ করিয়াছি। এক্ষণে এই প্রবন্ধে আজ্ঞার উপর উঠে জীব ঈশ্বর ও মায়া প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান আলোচনা করে কিরূপে সেই চরম সীমা "আমিতে" পৌঁছিতে হয় তাহাই বর্ণিত হইবে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৬৩ শ্লোক আছে যে—

ইতিতে জ্ঞান মাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্য তরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদ শেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥

এই শ্লোক হইতে প্রতিপন্ন হয় যে মানুষ প্রকৃতি পরতন্ত্র, স্বভাব পরতন্ত্র এবং ঈশ্বর পরতন্ত্র হ'লেও ইচ্ছাবিষয়ে মানবের স্বাতন্ত্র্য আছে। এই শক্তি থাকাতেই মনুষ্যের পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব।

গীতার নবম অধ্যায়ের ২৯ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন।

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু নমে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়িতে তেষু চাপ্যহম্ ॥

আমি সর্ব্বজীবের পক্ষেই একরূপ ; আমার কেহ প্রিয় বা কেহ অপ্রিয় নাই। যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করে, সে ব্যক্তিকে আমি অনুগ্রহ করিয়া থাকি। ভগবানের কাছে কেহ প্রিয়ও নহে, অপ্রিয়ও নহে। তিনি কর্ম্ম ফল বিধাতা।

সাধনার পরপর চারটী ক্রম আছে। প্রথম "মন্মনা ভব"। অর্থাৎ আমাতে বা কূটস্থ চৈতন্যে অথবা পিটুটারী দেহে, যেখানে ক্রমে মন ও বুদ্ধিকে একাগ্র করিয়া লইয়া আসিয়াছ, সেই স্থানে মনকে সম্পূর্ণ রূপে সংযত কর। দ্বিতীয় ক্রম "মদ্ভক্ত হও" অর্থাৎ একমাত্র আমাতে অনুরক্ত হও অর্থাৎ মনের আসক্তি একমাত্র কূটস্থে রাখ, অন্য কিছুতেই মন দিও না। তৃতীয় ক্রম "মদ্‌যাজী ভব"। অথাৎ মন্ত্র সহযোগে আমার পূজাকর। অর্থাৎ আমার যে মন্ত্র প্রণব, সেই প্রণব উচ্চারণ কর, সেই সঙ্গে আত্মা-মন প্রাণ আমাতে সমর্পণ কর। তারপর চতুর্থ ক্রম "মাং নমস্কুরু"। কৃতাঞ্জলি পুটে শির বা মস্তক সংযুক্ত করিয়া আমার সম্মুখে দণ্ডবৎ নত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন ক্রমের পর আমার সমীপস্থ হ'য়ে আমাকে স্থির নেত্রে চেয়ে থেকে ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি যুক্ত কর। নিশ্চেষ্ট হও। এই ক্রিয়ায় দুই শক্তি (ক্রিয়া শক্তি ও জ্ঞান শক্তি) যখনই যুক্ত হবে, তখনই সাম্য ভাব আস্‌বে। ইন্দ্রিয় সমূহ নিষ্ক্রিয় হবে, দৃশ্য থাকবে না। অভ্যাস পাকা না হওয়া পর্য্যন্ত এই দর্শন, অদর্শন বারবার

হবে। ইহাই নমস্কার। ইহার শেষ ফল আমাতে এসে মিশে "আমি" হয়ে যাবে। "সোহহং" অবস্থা পাবে। এটী একেবারে ধ্রুব সত্য।

মনই মনুষ্যের বন্ধন এবং মনই মোক্ষের কারণ। আমি মনকে দুমুখো সর্পের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট মনে করি। কারণ মনকে আত্মদর্শনে লীন করা যায় এবং মনকে অতি নীচ কর্ম্মেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এইজন্য গীতা বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোহনু বিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ু র্নাবমিবাম্ভসি ॥

বিষয় বিলাসী ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটী ইন্দ্রিয়কে লক্ষ্য করিয়া যখন মন ধাবিত হয়, তখন জলের উপর ভাসমান নৌকাকে প্রতিকুল বায়ু যেমন বিচলিত করে, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রিয় সাধকের প্রজ্ঞা হরণ করিয়া লয়।

যোগাভ্যাসকালে সাধকগণকে যোগের অষ্টাঙ্গের যে যম, নিয়মাদি সাধনার বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা প্রতি পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু এ সংসারে গৃহী মাত্রেরই সেই সকল নিয়ম পালন করা অসম্ভব। তবে কি যোগ সাধনা হইবে না? হইবে; আসক্তি শূন্য হইয়া সকল কার্য্যই করা যাইতে পারে। আসক্তি শূন্য কার্য্যই শ্রেষ্ঠ। সৎপথে থাকিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কারণ অর্থ বিনা কোন সৎ কার্য্যও সুসম্পন্ন হয় না। কিন্তু অর্থ উপার্জ্জনে আসক্তি বা ব্যাকুলতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। গীতাও বলিয়াছেন, যে,

যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধা ব সিদ্ধৌ চ কৃত্বাহপি ন নিবধ্যতে॥

বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা না করিয়াও যাহা অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ প্রার্থনা ও উত্তম ব্যতীত যাহা প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাতেই যিনি সন্তুষ্ট থাকেন ; যিনি ক্ষুধা তৃষ্ণা শীত ও উষ্ণ আদি দ্বন্দ্বের মধ্যেও স্থিরভাবে ব্রহ্মকে অনুভব করেন, এবং কার্য্যকালে ফল লাভ হইলে অথবা না হইলেও যাঁহার চিত্তে বিকার জন্মে না, তিনি কর্ম্ম করিলেও বন্ধন দশাগ্রস্ত হন না।

যেন সর্ববদা মনে থাকে,"আমি অকর্ত্তা"। সমস্তই ভগবানের, আমি নিমিত্ত মাত্র। তাঁহার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা ও শান্তি সংস্থাপনের জন্য আমাকে এই মর্ত্ত্য লোকে প্রেরণ করিয়াছেন। স্ত্রী পুত্র কন্যাদির প্রতি মায়াতেও ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করা কর্ত্তব্য। ভগবান আমার উপর তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণেব ভার অর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমার তাঁহার আদেশ প্রতি পালন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহাদের দ্বারা কোন ভাবী সুখের আশা করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ আশা করিলেই সংসারে আসক্তি আসিয়া নিজেকে দুঃখ ভাগী হইতে হইবে। সকল বিষয়েই বৈরাগ্যের আশ্রয় লইতে হইবে। সর্ব্ব কর্ম্ম ফল ত্যাগী হইতে হইবে। একাগ্র চিত্তে সহস্রারের বিন্দু ধরে থাকলেই মনের উপর আধিপত্য জন্মে এবং প্রাকৃতিক আবরণ আপনা আপনিই ক্ষয় হয়।

যোগীরা বলেন, আমরা যখন তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিবার ইচ্ছা করি, চর্ম্ম চক্ষুর অগ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি

—অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু জানিতে ইচ্ছা করি, তখন আমরা প্রথমতঃ ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ করতঃ সমুদায় দিদৃক্ষা বৃত্তি পুঞ্জীকৃত করিয়া ললাট অভ্যন্তরস্থ চিত্তের উপর অর্পণ করি। তাহলে চিত্ত তখন একাগ্র হয় এবং ভৌতিক চক্ষুর সমুদায় শক্তি সেই একাগ্রীকৃত চিত্তে গিয়া আবিষ্ট হয়। তখন আমরা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভৌতিক চক্ষুর ও অন্যান্য ভৌতিক ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমূহ আকর্ষণ করিয়া তৎসমুদায় পুঞ্জীকৃত, কেন্দ্রীকৃত, বা একমুখ করিয়া তাহা চিত্তের উপর প্রয়োগ করি। এই কার্য্য করিবামাত্র আমাদের চিত্ত-স্থান (ললাট অভ্যন্তরস্থ পিনিয়াল গ্লাণ্ড ও পিস্যুটারী দেহ) যেন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে অর্থাৎ এক প্রকার আশ্চর্য্য আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। তখন অন্তরাকাশ সহস্রগুণ জ্যোতির্ম্ময় হয়, সুবর্ণাচ্ছাদিত ভ্রামরী গুহা দৃষ্টি গোচর হয়। তার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি আপ্না আপ্নিই নিস্তেজ হয়ে যায়। সুতরাং সেই জ্যোতিতে আমরা পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত বা দিদৃক্ষিত বস্তু অবাধে দেখিতে পাই। পৃথিবীর প্রান্তস্থিত বস্তু দেখিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের সেই প্রান্ত স্থানে যাইতে হয়না। তাহা আমরা এই ললাট মধ্যেই দেখিতে পাই। ঈপ্সিত বস্তু দেখিবার জন্য আমাদের কোন ভৌতিক আলোকের প্রয়োজন হয় না। সেই জ্যোতির্ম্ময়, আলোকময় বা প্রজ্ঞানময় সপ্তমেন্দ্রিয় বা তৃতীয় চক্ষুদ্বারা আমরা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ব্যবহিত, বিপ্রকৃষ্ট (বহু দূরস্থ) সমস্ত বস্তুই দেখিতে পাই।

এতাদৃশ তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ যোগ সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, বিবিধ অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, আধি দৈবিক ও আধিভৌতিক ঘটনা অনুভূত হইতে থাকে। বিবিধ অমানুষ দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশে দেবদেবীর মুর্ত্তি, কখন দেবানু চর দিগের ছায়া, কখন ইষ্ট দেবতার প্রতিমূর্ত্তি, কখন দিব্য গন্ধ, কখন বা দিব্যবাণী (দৈববাণী) কখন বা দিব্য নিনাদ জ্ঞানস্থ হয়। দেহাভ্যন্তরে কখন ঝিল্লীরব, কখন ঘণ্টা নিনাদ কখন বংশিধ্বনি, কখন বীণার শব্দ, হৃদয়ে কখন ইষ্ট দেবতার বা উপাস্য দেবতার উদয়, ইত্যাদি বহু অলৌকিক আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্ট, শ্রুত ও অনুভূত হইতে থাকে। সে সকল ব্যাপার সত্য? কি বিশ্বাসের ছলনা? তাহা আমরা জানি না। এ সম্বন্ধে সার উপদেশ এই যে, যখন দেখিবে, উক্ত প্রকার অলৌকিক বা অমানুষী কাণ্ড সকল প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তাহাকে সপ্ত-মেন্দ্রিয়ের অবতরণিকা বলিলে বলা যায়।

যোগীরা বলিয়া থাকেন, যে প্রত্যেক মনুষ্যের দৃশ্যমান দুইটী চক্ষু ব্যতীত আর একটী তৃতীয় চক্ষু আছে। যাবৎ না সেই তৃতীয় চক্ষু প্রস্ফুটিত হয় তাবৎ তাহা থাকা না থাকা তুল্য। যোগীরা সেই জন্য যোগানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে উন্মীলিত করিবার চেষ্টা করেন। দৃশ্যমান চক্ষুদ্বয় দ্বারা কেবল কতকগুলি স্থুল বাহ্য বস্তু দর্শন হয় মাত্র; কোন সুক্ষ্ম বা আভ্যন্তরীণ বস্তু দর্শন হয় না। কিন্তু প্রজ্ঞানময় তৃতীয় চক্ষু দ্বারা সূক্ষ্ম ব্যবহিত বিপ্রকৃষ্ট ও আভ্যন্তরীণ সমস্ত বস্তু দেখা যায়। যথা শ্রীমদ্ ভাগবতে আছে—

অনাগত মতীতঞ্চ বর্ত্তমান মতীন্দ্রিয়ম্।
বিপ্রকৃষ্টং ব্যবহিতং সম্যক্ পশ্যন্তি যোগিনঃ॥

যোগীগণ, ভবিষ্যৎ. অতীত, বর্ত্তমান অতীন্দ্রিয় বিপ্রকৃষ্ট (দূরস্থিত) ও ব্যবহিত (ব্যবধান বিশিষ্ট অর্থাৎ দৃষ্টির অন্তরালে স্থিত) বিষয় সমূহ সম্যকরূপে দর্শন করিতে পারেন। সেই তৃতীয় চক্ষুর অন্য নাম দিব্য চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু ও সপ্তমেন্দ্রিয় বা সপ্তভূমি ইত্যাদি। সেই জ্ঞান চক্ষুর আশ্রয় ভ্রূসন্ধির উপরিস্থ ললাট ভাগের অভ্যন্তর। ললাট অভ্যন্তরে ঐরূপ তৃতীয় চক্ষু আছে, তাহা জানাইবার জন্যই আমরা মহাযোগী শিবের ও শিবানীর ললাটে অন্য একটী জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু অঙ্কিত করি। আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয় পুস্তকে প্রত্যেক মনুষ্যের যে ঐরূপ তৃতীয় চক্ষু আছে তাহা জানাইবার নিমিত্ত পিনিয়ালগ্লাণ্ড ও পিসুটারী বডী নামক দুইটী শারীরিক যন্ত্রের (যাহা কালক্রমে তৃতীয় চক্ষু নামে আবির্ভূত হইবে) চিত্র দিয়াছি (৪র্থ চিত্র দেখ) যদ্দ্বারা পদার্থ সকলের অভ্যন্তরস্থ বিভাগের বিষয় যোগীরা দেখিতে পান।

পাঠক। যদি তুমিও ধ্যানী হও, যোগী হও ও জ্ঞানী হও, তোমারও তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হইবে।

তখনই জানিবে তোমার সিদ্ধি অদূরে। সুতরাং সেই সকল অমানুষী বা অলৌকিক আশ্চর্য্য দৃশ্য দর্শন বা সন্দর্শন করিয়া ভীত হইও না। মুগ্ধও হইও না। সে সকল ঘটনাকে জাগ্রৎ স্বপ্ন বা জাগ্রৎ ভ্রম মনে করিও না। বরং দৃঢ়তা সহকারে সমধিক উৎসাহী, সমধিক আনন্দিত ও যোগ বলের প্রতি

সমধিক বিশ্বস্ত হইও। তাহা হইলে শীঘ্রই তোমার সপ্তমেন্দ্রিয় বা দিব্য চক্ষু বিকশিত হইবে, শীঘ্রই তোমার অষ্ট মহাসিদ্ধি লাভ হইবে।

"কোঽহং, কিমিদং," যাবৎ না এই দুই বিষয়ের বিচার উদিত হয়, তাবৎ এই অন্ধকারোপম সংসার-আড়ম্বর বিদ্যমান থাকে। মিথ্যা ভ্রমের প্রভাবে উদ্ভূত এই শরীর রূপ পাদপ, যে ব্যক্তি ইহাকে আত্মভাবে না দেখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ দ্রষ্টা বা দর্শক। এই দেহে দেশ ও কালাদি উপলক্ষে শত শত সুখ দুঃখ আশ্রয় করিতেছে। যে ব্যক্তি সে সকলকে আমার মনে না করে, সেই অভ্রান্ত ব্যক্তিই যথার্থ দর্শক। এই যে অপার নভোমণ্ডল, এই যে দিক কালাদি এবং এই যে বিচিত্র ক্রিয়া বিক্রিয়া সমন্বিত বিশ্ব, এ সমস্তই "আমি" এবং সর্ব্বত্রই আমি, যে এই রূপ দেখিতে পায়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ চক্ষুষ্মান বা দ্রষ্টা। আমি কেশাগ্রের লক্ষ ভাগের এক ভাগের কোটী কোটী অংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, অথচ সর্ব্বব্যাপী, যে আপনাকে এইরূপ ছ্যাখে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ ছ্যাখে। যে ব্যক্তি আপনাকেও ইতরকে নিত্য অভেদ জ্ঞানের বিষয় জানিয়া এবম্প্রকার অবধারণ করে, যে এ সমস্তই চিজ্জ্যোতিঃ, বস্তুন্তর নহে, সেই পুরুষই দ্রষ্টা। যে মহাত্মা সর্ব্বান্তর সর্ব্বশক্তি (মা) অনন্তাত্মা অদ্বিতীয় চিৎবস্তুকে স্বীয় অন্তরে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। সুত্রে যেমন মণি গ্রথিত (মালা) থাকে, তাহার ন্যায় আমাতেই এ সমস্ত গ্রথিত আছে, ইহা যে ব্যক্তি জানে,

সেই ব্যক্তিই প্রকৃত দর্শক। সুখ, দুঃখ, হেয়, উপাদেয় ও অন্যান্য দৈহিক ভাব (গুরু, দেবতা ও শাস্ত্রাদি বিষয়ে শ্রদ্ধা ও নিত্যানিত্য বিবেকাদি) সমস্তই আমি, যিনি এইরূপ দেখেন, তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা। যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় বিমুক্ত হইয়াছেন, মৃত্যুরও আত্মা হইয়াছেন, স্বস্থ ও তুরীয়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পরমপদ প্রাপ্ত পুরুষকে আমি নমস্কার করি।

পঞ্চম অধ্যায়।

আত্মজ্যোতি দর্শন।

ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধন ও সপ্তমেন্দ্রিয়ের বিকাশ ব্যতিরেকে আত্মদর্শন সম্ভবেনা। এ বিষয়ে যোগী গুরুর মত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

জ্যোতিঃই ব্রহ্ম। সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র জ্যোতিঃ ছিল।

সদেব সৌম্য ইদমগ্রমাসীৎ এক-মেবা দ্বিতীয়ম্। শ্রুতি।

এখানে সৎ অর্থ জ্যোতিঃ। পরে সৃষ্টি আরম্ভ হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব হইতে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত ঐ ব্রহ্মজ্যোতি হইতে সমুৎপন্ন হয়। সেই স্বপ্রকাশ রূপী অক্ষর পরম জ্যোতিঃই, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব পদ বাচ্য। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই জ্যোতিঃ

মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাহা কিছু তৎসমস্তই ঐ ব্রহ্মজ্যোতিঃ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

এই জ্যোতিই আত্মারূপে মানব দেহের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। সেই আত্মা ব্রহ্মরূপ হইয়াও মায়া প্রভাবে বিষয়াসক্ত বলিয়া নিজেকে নিজে জানেন না। পরম ব্রহ্ম স্বরূপ পরমাত্মা সর্ব্ব দেহেই এবং বিশ্বের সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। যথা—শ্বেতাশ্বর উপনিষৎ।

যো দেবঃ অগ্নৌ, যোঽপসুঃ, যো বিশ্বং ভুবনং আবিবেশ।
য ওষধিষুঃ, যো বনস্পতিষুঃ, তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ॥
একো দেবঃ সর্ব্বভুতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভুতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্ব ভূতাধিবাসঃ সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥

যে দেব অগ্নিতে, যে দেব জলে, যে দেব সমস্ত বিশ্বে অনুপ্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন; যে দেব ওষধি সমূহে, যে দেব বনস্পতি সমূহে বিরাজ করিয়া রহিয়াছেন, সেই দেবকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

এক দেব পরমাত্মা সর্ব্বভুতে গূঢ় অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভুতের অন্তরাত্মা, কর্ম্মের অধ্যক্ষ, সকল ভূতাধিবাস, সাক্ষী, চৈতন্য, কেবল ও নির্গুণ॥

তিলেষু তৈলং দধিনীবসর্পি—
রাপঃ স্রোতঃস্বরণীষু চাগ্নিঃ।
এবমাত্মাত্মনি গৃহ্যতে ঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যো হনুপশ্যতি॥

সর্ব্বব্যাপিন মাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতম্।
আত্মবিদ্যাতপোমূলং, তদ্‌ব্রহ্মো পণিষৎ পরম্॥

যেমন যন্ত্রের সাহায্যে তিলে তৈল, মন্থন দণ্ডের সাহায্যে দধিতে ঘৃত, খনিত্রাদির সাহায্যে নদীতে জল এবং মন্থন কাষ্ঠের সাহায্যে কাষ্ঠ বিশেষে অগ্নিপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপ যিনি সত্য নিষ্ঠা ও ধ্যানযোগাদি দ্বারা পরমেশ্বরকে অন্বেষণ করেন, তিনি আত্মাতেই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। ঘৃত যেমন দুগ্ধের সমস্ত অবয়বেই অবস্থান করে, মন্থন দণ্ডের সাহায্যে উহাকে বাহির করিয়া লইতে হয়, তদ্রূপ আত্মা দেহের সর্ব্বস্থান ও বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, আত্মবিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে পৃথক করিয়া লইতে হয়। ঐ আত্মা উপনিষৎ প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ আত্মার তাদৃশ স্বরূপ উপনিষদেই প্রতিপাদিত আছে। তদনুসারে উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে আত্মাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। যিনি তাহা করিতে পারেন, তাঁহারই আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে। তপস্যাই আত্ম দর্শনের মূল।

সকল মানবেরই প্রকাশ্য দুই চক্ষু ভিন্ন আর একটী গুপ্ত নেত্র আছে। সেই তৃতীয় নেত্রের নাম "গুরু নেত্র"। আমি তাহারই নাম "সপ্তমেন্দ্রিয়" বলিয়াছি। যোগ সাধন দ্বারা চিত্ত নির্ম্মল ও স্থির হইলে ঐ গুরুনেত্র প্রকাশিত হয়। তখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বহু দূর-দূরান্তরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায়। ঐ গুরু নেত্র বা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা আজ্ঞা চক্রের (অর্থাৎ পিনিয়াল

ণ্ডাণ্ড ও পিস্থটারী দেহের) উর্দ্ধে নিরালম্ব পুরীতে ঈশ্বর সন্দর্শন বা ইষ্টদেব দর্শন কিম্বা কুলকুণ্ডলিনীর স্বরূপ রূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিলে স্থির আত্মজ্যোতি প্রকাশক একটী মানস চক্ষু ফুটে উঠে। তাতেই ত্রৈকালিক ঘটনাবলি দৃষ্টিগোচর হয়। তাহাকেই আমি সপ্তমেন্দ্রিয় বলিয়াছি। সঞ্জয়, বেদব্যাসের কৃপায় এবং অর্জ্জুন বাসুদেবের কৃপায় এই সপ্তমেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছিলেন। এই জ্ঞান নেত্র দ্বারাই দেহস্থিত ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃ দর্শন করা যায়। যথা—

চিদাত্মা সর্ব্ব দেহেষু জ্যোতিরূপেণ ব্যাপকঃ।
যোগশাস্ত্র॥

চিদাত্মা জ্যোতিরূপে সকল দেহেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন। গুরুনেত্র বা জ্ঞাননেত্র দ্বারা তাহা দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই আত্মজ্যোতি সর্ব্বদা শান্ত, নিশ্চল, নির্ম্মল, নিরাধার, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প ও দীপ্তিমান।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি স্তমসঃ পরমুচ্যতে। গীতা
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞান গম্যং হৃদি সর্ব্বস্থ বিষ্ঠিতম্॥

তিনি সূর্য্যাদি জ্যোতির জ্যোতিঃ স্বরূপ। জড় বর্গ রূপ তমঃ শক্তির অতীত। তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞেয়, তিনিই জ্ঞান-গম্য তিনিই সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

আদিত্য, ইন্দু, বিদ্যুৎ ও অগ্নি আদি প্রকাশক পদার্থ পুঞ্জের প্রকাশ শক্তি তিনিই। অর্থাৎ পরব্রহ্মের দিব্য জ্যোতিতেই

ইঁহাদের এত জ্যোতি। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—"যেন সূর্য্যস্তপতি", "যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। ব্রহ্মের তেজেই সূর্য্য তাপযুক্ত ও তাঁহারই দিব্য প্রকাশে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হইয়াছে। সূর্য্যাদি জড়বর্গের সহিত সম্বন্ধ জন্য পাছে অর্জ্জুন মনে করেন, যে—তবে পরব্রহ্মও জড় স্বভাবযুক্ত। সেই জন্য ভগবান বলিলেন যে তিনি কার্য্য প্রপঞ্চ সহিত অবিদ্যারূপ অন্ধকারের অতীত। তিনি কেবল অলৌকিক জ্যোতিই নহেন, বিশুদ্ধ চিত্তবৃত্তির অভিব্যক্তিরূপ সংবিৎ বা জ্ঞান স্বরূপও তিনিই। জ্ঞানোদয় হইলে যাহাকে জীব জানিতে চায়, সেই জ্ঞেয় পদার্থও তিনি। এই অধ্যায়ের প্রথমে যে জ্ঞানের সাধনাঙ্গ ক্রম কথিত হইয়াছে, সেই ক্রম ব্যতীত তিনি অন্য কোনরূপ ক্রিয়া বা কল কৌশলে প্রকাশিত হয়েন না। তিনি স্বর্গাদির ন্যায় দূরস্থ নহেন। তিনি সকল জীবের আত্মারূপে অবস্থিতি করিতেছেন। চিত্তের নির্ম্মলতা হইলেই তিনি সকলের অব্যবহিতরূপে অনুভূত হয়েন।

দুগ্ধ মন্থন করিয়া যেমন নবনীত উত্তোলন করা যায়, সেইরূপ সাধনাঙ্গ ক্রম অনুষ্ঠান দ্বারা আত্মজ্যোতি দর্শন হইলে জীবের মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে আত্মজ্যোতি দর্শন করা কর্ত্তব্য। শাস্ত্র বাক্য এই

"আত্মজ্যোতি দর্শন মাত্রেন জীবন্মুক্তোন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ আত্মজ্যোতি দর্শন মাত্র মানব নিচয় জীবন্মুক্ত হয়। অতএব সকলেরই আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা উচিত। অন্যান্য

প্রকার যোগ সাধন অপেক্ষা আত্মঃজ্যোতি দর্শন ক্রিয়া সহজ ও সুখসাধ্য।

এক্ষণে শাস্ত্র সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়। সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাস্ত্র অর্থে বেদকে বুঝায়। বেদ বিহিত ধর্ম্ম বা নিয়মকে শাস্ত্র বিধি বলে। মূলাধারাদি সহস্রার পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্যঃ এই সপ্ত ব্যাহৃতি স্থানের জ্ঞানকে বেদ বলে। এই বেদ বা জ্ঞানে জীবের আত্মোন্নতি সাধন হয়। বেদ ব্রহ্মার মুখ হইতে উচ্চারিত। ব্রহ্মার বাক্যই শাস্ত্র।

শাস্ত্রবিধি শব্দের আর এক অর্থ আছে। যাতে শাসন করে, তাকেই শাস্ত্র বলে। এই শরীরের শাসনকর্ত্তা বায়ু। পূর্ব্বে বায়ু সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। কিন্তু সাধকদিগের মনে দৃঢ় সংস্কার বদ্ধমূল করিবার জন্য আর একটু বায়ু সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন। যাহা হউক বায়ু দ্বারাই শরীরের ক্রিয়া চল্‌চে। বায়ু একটু এদিক ওদিক হ'লে আর শরীর থাকে না, কাজেই শরীরে বায়ুই শাস্ত্র। বায়ু প্রাণরূপে জীবের জীবন রক্ষা কচ্চেন। এই বায়ু সম ও সূক্ষ্ম হয়ে ক্রিয়া করলে জীবকে জ্ঞান দেন- ব্রহ্মত্ব দেন, এবং বিকৃত হলে পাগল করেন। সুতরাং শরীরের শাসক এই বায়ুকে আয়ত্ত কত্তে পাল্লেই জীবের আত্মোন্নতি হয় তাই জন্য এই বায়ু ক্রিয়া সম্বন্ধে যা নিয়ম আছে, তাহাই শাস্ত্রবিধি। অর্থাৎ প্রাণায়াম সম্বন্ধীয় নিয়মকেই শাস্ত্রবিধি বলে। এই নিয়মও ঐ ব্রহ্মার অনুশাসন বাক্য বই আর কিছুই নয়।

ষটচক্রের ক্রিয়াই বেদের কর্ম্মকাণ্ড এবং সহস্রার ক্রিয়াই জ্ঞানকাণ্ড। শরীরের মধ্যে প্রশ্বাস গ্রহণের সময় বহিরাকাশের বিমল বায়ুকে নাসারন্ধ্র ও গলগহ্বর দিয়ে বায়ুপথে মূলাধারে নিয়ে এসে ঐ বায়ু সহ গুরুপদিষ্ট চিত্তপথে (ব্রহ্মনাড়ীতে) উঠে, শক্তিসমূহকে (ডাকিনী রাকিনী লাকিনী. কাকিনী শাকিনী ও হাকিনী) (ডরলক শাহা প্রভৃতি ডকারাদি শক্তিকে) প্রবোধ দিতে দিতে পরমশিবে কুলকুণ্ডলিনীকে মিলিয়ে, আবার বিপরীত ক্রিয়ায় নিশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে ঐ বায়ুকে বাহিরাকাশে স্থাপন করাকে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম বলে। এই ক্রিয়াটীর অহোরাত্রের সংখ্যা ২১৬০০।

বায়ুর দুইটী গুণ, শব্দ ও স্পর্শ। গুরুগণ বলেন বায়ু সূক্ষ্ম নাড়ী পথে চালিত হ'লে সপ্তত্বচা শীতল বোধ হয়, অব্যক্ত স্পর্শসুখে মনে আনন্দ সঞ্চার হয়, আর ভেতরে নানা প্রকার শব্দের উত্থান হয়। সেই সব শব্দ ক্রমে নাদে পরিণত হয়, এবং নাদ হইতে বিবিধ প্রকার বাক্য লহরী প্রবাহিত হয়। সেই বাক্য লহরীতে চিত্ত সংযম কল্লে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি সমগ্র জ্ঞানের বিষয় শুনতে পাওয়া যায়। এই সমস্ত জ্ঞান শাস্ত্ররূপী বায়ু দ্বারাই উৎপন্ন হয়, এবং সেই জ্ঞানেই সংসার চল্‌তে থাকায় ঐ শ্রুতি স্মৃতিকেও শাস্ত্র বলে। দয়াবান্ আর্য্য ঋষিগণ সেই সমস্ত জ্ঞানশাস্ত্র নামে ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ কোরে গিয়েছেন। শুধু শোনাই নয়। ঐ নাদের মধ্যে থেকে একটা জ্যোতি ফুটে উঠে, সেই জ্যোতিতে ভূত-

ভবিষ্যতের ব্যাপার দেখা যায়। কাজেই বায়ু সাধককে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী করেন, ও তার জ্ঞানকেও শাসনে রাখেন।

যাহা হউক যাঁহারা সাধন মার্গে একটু অগ্রসর হয়েছেন, তাঁহারা বায়ুর এই আশ্চর্য্য ক্রিয়া বুঝ্তে পারেন। দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের অন্তঃকরণে জাগ্রত অবস্থায় সাধারণতঃ যে সব ভাব প্রকাশ পায়, আসন কোরে বোসে ক্রিয়া করবার সময় একটু সূক্ষ্মপথে বায়ু প্রবেশ কল্লেই সে সব ভাব আর অন্তঃকরণে স্থিরভাবে থাকেনা। এমন হয়, মন হু হু কচ্চে, কিছু ভাল লাগছে না, এক জায়গায় থাকতে ইচ্ছা কচ্চে না ; এমন অবস্থায় যদি শরীরের বায়ুর গতি ফিরিয়ে দেও, বায়ুর উপর মন ফেলে বায়ুকে কুটস্থের বা পিনিয়াল-গ্লাণ্ডেরদিকে চালিয়ে দাও, তা হলে বায়ু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মনের পূর্ব্ব অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। বায়ু যেই সূক্ষ্ম পথে চল্‌তে আরম্ভ করে, অমনি মনের এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হয়। মন বহুব্যাপী হয়ে পড়ে ; কত কালের কথা, কত ভাল মন্দ ভাব সব একেবারে মনের মধ্যে উদয় হয়। মন নূতন কোরে যেন সেই সব ভাব একবার ভেবে ন্যায়। কৃত কর্ম্মের সংস্কারের এমনি প্রতাপ। তারপর বায়ু সম হ'য়ে গেলে, বাইরের ভাব আর ভেতরে প্রবেশ করে না। অন্তঃকরণ ভেতরের ব্যাপারেই আকৃষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, বায়ু যখন সূক্ষ্ম হয়ে আসে, বায়ুকে যেখানে ইচ্ছা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারা যায়, সংযত কর্ত্তেও পারা যায়। তখন দেখ্‌তে পাওয়া

যায়, বায়ু স্থান বিশেষে অন্তঃকরণে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদয় করেন। এমন কি মনে কোন কিছু জানবার প্রবল ইচ্ছা থাক্‌লে, বায়ু সেই ইচ্ছার সঙ্গে একীভূত হয়ে চৈতন্যময় হয়ে যান্ এবং মনকে লক্ষ্য স্থানে স্থির, ধীর ভাবে আটকে রেখে, কে যেন কি বলে গেল, এই রকম ভাবে অশরীরী বাণীতে মনের মধ্যে জানবার বিষয়টী বোলে দেন। সেই বাণী বলা এবং মনের সেই বাণী শোনা ঠিক যেন বিদ্যুৎ চম্‌কে যাওয়ার মত কাজ হয়। তা শোনবা-মাত্র মন পরিতৃপ্ত হ'য়ে যায়, বুঝতে বাঁকী থাকা বা একটু একটু সন্দেহ থাকা, কিছুই থাকে না। মন সে বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহে স্থির নিশ্চয় হয়ে যায়। সে বাণীর এমনি শক্তি, আমার অলৌকিক রহস্য পুস্তকের "দৈববাণী" নামে প্রবন্ধ পাঠ করুন। গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের ২৪শে শ্লোকে আছে। যথা—

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

কার্য্য এবং অকার্য্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে শাস্ত্রই প্রমাণ। সেই হেতু শাস্ত্র বিধানোক্ত কর্ম্ম জানিয়া সাধন করিতে যোগ্য হও।

কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই যে প্রমাণ বা নিশ্চয়ের হেতু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বলেন, প্রমাণ অর্থে জ্ঞান ও সাধন। কোন একটা বিষয় কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য তা জানতে হ'লে শাস্ত্রই সেই নিশ্চয়ের হেতু হয়। কারণ শাস্ত্র অর্থাৎ শরীরের শাসক বায়ুই বুদ্ধি ক্ষেত্রে সংযত হয়ে বুদ্ধিকে

সচেষ্ট কোরে বিকশিত কোরে, কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যের নিরূপণ করে দেন। কাজেই সাধক! কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থা বা কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য অবধারণ ক'ত্তে হ'লে তুমি বায়ুরূপী শাস্ত্রের আশ্রয় নিও। বায়ুরূপী শাস্ত্র ব্রহ্ম পথ, পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়ে তোমাকে ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান দিবেন।

কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই যে প্রমাণ তাহা নির্দ্ধারণের অন্য উপায় আছে। সত্ত্ব, রজঃ তম এই তিন গুণ এবং পৃথিবী জল তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ তত্ত্বের ক্রিয়া শরীরে সকল সময়ে সমান থাকে না। তাহার কারণ আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এই উন পঞ্চাশ বায়ু প্রতিদিন জীবের শরীর মধ্যে যথাক্রমে প্রবাহিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ উন পঞ্চাশ বায়ুর আকর্ষণে ও বিকর্ষণে নানাপ্রকার তত্ত্বের ও গুণের বিকাশ শরীর মধ্যে সময়ে সময়ে উদয় হইয়া থাকে। এক এক সময়ে এক একটী গুণ ও এক একটী তত্ত্বের ক্রিয়া প্রবল হয়। প্রত্যেক গুণ ও তত্ত্ব কর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন করে। কোন কাজ করবার সময় সেই কাজের ফলাফল জেনে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিরূপণ ক'ত্তে হলে শরীরে তখন কোন গুণ এবং কোন তত্ত্বের ক্রিয়া চল্‌চে, তা দেখলেই জানতে পারা যায়। প্রত্যেক গুণ ও প্রত্যেক তত্ত্বের আলাদা আলাদা রং আছে, তাই দেখেই শরীরে কোন গুণ এবং কোন তত্ত্বের ক্রিয়া চল্‌চে, বুঝ্‌তে পারা যায়। রজঃ সত্ত্ব ও তমঃ এই তিন গুণ ত্রিকোণাকারে তিনটী বিন্দুরূপে লক্ষ্য হয়। রজোগুণটী বা বিন্দুটী ঐ ত্রিকোণের বাম কোণে

লক্ষ্য হয়, তার নাম "বামা" এবং তার রং লাল। সত্ত্ব বিন্দুটী ঊর্দ্ধকোণে দৃষ্ট হয়, তার নাম "জ্যেষ্ঠা" এবং তার রং শুভ্র। তমো বিন্দুটী দক্ষিণ কোণে দৃষ্ট হয়, তার নাম "রৌদ্রী" এবং তার রং কাল। ক্ষিতির রং হলদে, জলের রং ফিকে সবুজ, তেজের রং লাল, বায়ুর রং ধূম্র, এবং আস্‌মানী। এই সব রং, বায়ুই কুটস্থে প্রকাশ করে দেন। বায়ুকে গুরূপদিষ্ট নিয়মে টেনে নিয়ে কূটস্থ লক্ষ্য কল্লেই শরীরে যে গুণ প্রবল, তা'র বিন্দুটী এবং যে তত্ত্বের ক্রিয়াটী চল্‌ছে, তা'র রং দেখতে পাওয়া যায়। তাই দেখেই যোগীগণ—কর্ম্মের ফলাফল জেনে কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যের স্থির করেন। ক্ষিতির রং দেখলে বুঝতে হবে, যে কর্ম্মে আশু ফল পাওয়া যাবে, শুভজনক, নিরাপদ ইত্যাদি। জলের রং দেখ্‌লে বুঝতে হবে যে ফল পাওয়া সন্দেহ জনক। তেজের রং দে'খ্‌লে বুঝ্‌তে হবে, কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হবে না, ফল পাওয়া যাবে না। বায়ুর রং দেখ্‌লে বুঝ্‌তে হবে, শুভ হতেও পারে, কিন্তু শুভ হলেও তাহা স্থায়ী হবেনা। আকাশের রং দেখলে বুঝ্‌বে, ফল ফলবে, কিন্তু বিলম্বে। তিন গুণের ঐ যে তিনটী বিন্দু ত্রিকোণাকারে দেখা যায়, ওর মধ্যে যে গুণটী প্রবল হয়, সেই গুণের বিন্দুটীই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, উজ্জ্বল হয়। শরীরে রজোগুণের প্রকাশ যখন দেখ্‌বে তখন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হবে, ধর্ম্ম লাভ হবে, কারণ "বামা" ধর্ম্ম দায়িনী শক্তি। সত্ত্বগুণের প্রকাশ যখন দেখ্‌বে, তখন কেবল অর্থের কর্ম্ম করবে, তারই ফল পাওয়া যাবে ; অন্য কোন কর্ম্ম করবে না, কারণ "জ্যেষ্ঠা"

অর্থ দায়িনী শক্তি। এবং তমোগুণের প্রকাশ যখন দেখবে, সে সময়ে কাম্য কর্ম্মের উদ্দেশে যাত্রা করলে অভীষ্ট সিদ্ধি হবে ; কারণ "রৌদ্রী" কাম সিদ্ধি দায়িণী শক্তি। এই তিন বিন্দু মিলে এক হলে ঐ ত্রিকোণের কেন্দ্র স্থলে শ্রীবিন্দু প্রত্যক্ষ হন ; তিনি মুক্তি দায়িনী শক্তি। সাধক এক মাত্র বায়ুর সাহায্যেই এই সব তত্ত্ব দর্শন করেন এবং তার ফল জেনে, তা থেকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির কত্তে পারেন। কাজেই কার্য্যাকার্য্যে ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই প্রমাণ।

এক্ষণে সেই ব্রহ্ম স্বরূপ জ্যোতিঃ দর্শনের উপায় যাহা যোগী-গুরু নিরূপণ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিব। যোগ সাধনোপযোগী স্থানে, সাধক স্থির চিত্তে যথা নিয়মে, আসনে (যাঁহার যে আসন উত্তম রূপ অভ্যাস আছে) উপবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত শুক্লাব্জে গুরুর ধ্যানান্তর প্রণাম করিবেন। কারণ গুরু কৃপা ব্যতীত জ্যোতিরূপ আত্ম দর্শন হয় না। যোগশাস্ত্র বলেন।

অনেক জন্ম সংস্কারাৎ সৎগুরু সেব্যতে বুধৈঃ।
সন্তুষ্ট শ্রীগুরুদেব আত্ম রূপং প্রদর্শয়েৎ ॥

বহু জন্মান্তরের সংস্কার বশতঃ পণ্ডিত ব্যক্তি সদ্‌গুরুর সন্তোষ সাধন করিলে গুরু কৃপায় আত্ম জ্যেতিঃ দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব গুরুর ধ্যান ও প্রণামান্তর মন স্থির করিয়া মস্তক, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও উদর সমভাবে রাখিয়া স্বীয় শরীরকে সোজা করিয়া উপবেশন করিবেন। পরে নাভিমণ্ডলে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া উড্ডীয়ান বন্ধ সাধন করিবেন। অর্থাৎ-নাভির অধস্থিত অপান

বায়ুকে গুহ্যদেশ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক নাভিদেশে কুম্ভক দ্বারা ধারণ করিবেন। যথা শক্তি পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ করিতে হইবে। ঐরূপ মানস যোগ ত্রিসন্ধ্যা করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রতিদিন ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে এই তিন সময়ে ঐরূপ নাভি দেশে বায়ু ধারণ করিতে হইবে। যাবৎ নাভিস্থিত অগ্নিকে জয় করিতে না পারা যায়, তাবৎ অনন্য মনে ঐরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

সর্ব্বপ্রকার যোগ সাধনের সহজ ও শ্রেষ্ঠ পন্থা নাভি পদ্ম। নাভিদেশ হইতে সাধনা আরম্ভ করিলে শীঘ্র সুফল পাওয়া যায়। নাভিস্থানে বায়ু ধারণা করিলে প্রাণ ও অপান বায়ুর একত্ব হয়, এবং কুণ্ডলিনী সুষুম্নার দ্বার পরিত্যাগ করেন। তখন প্রাণবায়ু সুষুম্না মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে।

প্রথম ক্রিয়া নাভিদেশ হইতে আরম্ভ না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। নিত্য নিয়মিত রূপে ঐরূপ নাভি স্থানে বায়ু ধারণ করিলে প্রাণবায়ু অগ্নি স্থানে গমন করিবে। তখন অপান বায়ু দ্বারা শরীরস্থ অগ্নি ক্রমশঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। ঐরূপ ক্রিয়া করিতে করিতে আট দশ মাসের মধ্যে নানাবিধ লক্ষণ অনুভূত হইবে। নাদের অভিব্যক্তি, দেহের লঘুতা, মল মূত্রের হ্রস্বতা এবং জঠরাগ্নির দীপ্তি ইত্যাদি নানারূপ লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

উপরোক্ত লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইলে, নাভিস্থানে কুম্ভক করিয়া প্রসুপ্ত কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিবেন। কুণ্ডলিনী ধ্যান

যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। ঐরূপ বায়ু ধারণ ও কুণ্ডলিনীর ধ্যান করিলে, কুণ্ডলিনী, অগ্নি কর্ত্তৃক সন্তাপিত বায়ু দ্বারা প্রসারিত হইয়া ফণা বিস্তার পূর্ব্বক জাগরিত হইয়া উঠিবেন। যতদিন মন সম্পূর্ণ ভাবে নাভিস্থানে সংলীন না হয় তাবৎ এই রূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া উর্দ্ধমুখে চালিত হইলে প্রাণ বায়ু সুষুম্না ভিতরে গমন করিবেন ; এবং সমস্ত বায়ু মিলিত হইয়া অগ্নির সহিত সর্ব্ব শরীরে বিচরণ করিতে থাকিবেন। যোগীগণ এই অবস্থাকে "মনোন্মনী" সিদ্ধি বলেন। এই সময় নিশ্চয়ই সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট ও শরীরে বল বৃদ্ধি এবং কখন কখন সমুজ্জল দীপ শিখার ন্যায় জ্যোতিঃ দর্শন হইয়া থাকে।

ঐরূপ লক্ষণ অনুভূত হইলে তখন নাভিস্থল ত্যাগ করিয়া অনাহত পদ্মে কার্য্য আরম্ভ করিবেন। এখানেও প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা যথা নিয়মে আসনে উপবিষ্ট হইয়া মূলবন্ধ সাধন করিবেন। অর্থাৎ মুলাধার সঙ্কোচ করিয়া অপান বায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক প্রাণ বায়ুর সহিত ঐক্য করিয়া কুম্ভক করিবেন। প্রাণবায়ু হৃদয় মধ্যে নিরুদ্ধ হইলে পদ্ম সমুদয় উর্দ্ধমুখ ও বিকশিত হইবে। অনাহত পদ্মে বায়ু ধারণা অভ্যাস করিতে করিতে প্রাণ বায়ু অনাহত পদ্মে প্রবিষ্ট ও সংস্থিত হইবে। সেই সময় ভ্রু যুগলের মধ্যস্থিত পিনিয়াল গ্লাণ্ডেও পিসুটারী দেহে সুষুম্না বিবরে বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে থাকিবে। সাধকের নয়ন নিমিলিত অবস্থায় অন্তরে নির্ব্বাতস্থ দীপ কলিকার ন্যায় জ্যোতি দৃষ্টি গোচর হইবে।

উক্ত লক্ষণ সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিলে, তখন বীজমন্ত্র বা প্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ পূর্ব্বক ভ্রূযুগলের মধ্যস্থিত আজ্ঞা চক্রে আরোপিত করিয়া আত্মাকে ধ্যান করিবেন। আজ্ঞা চক্রে বায়ু নিরোধ পূর্ব্বক এইরূপে ধ্যান করিতে করিতে চিত্ত একেবার লয় প্রাপ্ত হইবে। এই সময় সাধকের সহস্রার বিগলিত অমৃত ধারায় কণ্ঠকুপ পূর্ণ হইবে। ললাটে বিদ্যুতের ন্যায় উজ্জ্বল আত্মঃজ্যোতি দর্শন লাভ হইবে। তখন দেবতা, মুনি ঋষি প্রভৃতি বহু অদৃষ্ট পূর্ব্ব দৃশ্য সাধকের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এবং সাধক তখন আপনে আপনি হইয়া পরমানন্দ অনু- অনুভব করিবেন। ভুক্তভোগী ভিন্ন সেভাব অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব।

যে পর্য্যন্ত মেরুদণ্ড মধ্য চিত্ত সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থির না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধক পুনঃ পুনঃ বায়ু ধারণ ও ললাটস্থিত পিনিয়াল গ্লাণ্ডে ও পিটুটারী বিন্দুতে বীজ মন্ত্র রূপ পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আত্ম জ্যোতি ধ্যান করিবেন। ক্রমশঃ সাধক কাম কলার অর্থাৎ ত্রিকোণ পীঠের ত্রিবিন্দুর (যাহার পূর্ব্বে আভাস দিয়াছি) সহিত মিশিয়া যাইবেন এবং ললাটস্থ "শ্রীবিন্দু" বিকসিত হইবে।

যাহাদের মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, তাঁহারা আর ও সহজ উপায়ে আত্মজ্যোতি দর্শন করিতে পারেন। রাত্রিকালে গৃহের ভিতরে নির্ব্বাত স্থানে সোজা হইয়া উপবেশন করিয়া আপন চক্ষুর সম- সূত্র পাতে মাটীর-প্রদীপ সরষে তৈল দ্বারা জ্বালিয়া রাখিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে গুরুর ধ্যান ও প্রণামান্তর ঐ দীপালোকে

স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিবেন। যতক্ষণ চক্ষুতে জল না আসে ততক্ষণ চাহিয়া রহিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন দৃষ্টি দৃঢ় হইবে তখন একটী নীল বর্ণের জ্যোতি দেখিতে পাইবেন। ক্রমশঃ আরও অভ্যাসে ঐ দীপালোক হইতে দৃষ্টি অপসৃত করিয়া যেদিকে চাহিবেন, ঐ নীল জ্যোতি দৃষ্ট হইবে। তখন নয়ন মুদ্রিত করিলেও ঐরূপ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবেন। ক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একদৃষ্টে নাভি স্থানে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে মনঃস্থির হইবে। ঐরূপ অভ্যাস করিতে করিতে যখন অন্তরে ও বাহিরে নীলবর্ণের জ্যোতি দৃষ্ট হইবে, তখন ঐ দৃষ্টি হৃদ্দেশে আনিবেন। তথা হইতে নাসাগ্রে, তৎপরে পিনিয়াল গ্লাণ্ডে ও পিস্যুটারী বিন্দুতে আনিবেন। তথায় দৃষ্টি স্থির হইলে শিবনেত্র করিবেন। শিবনেত্র করিয়া যখন চক্ষুর তারা সম্পূর্ণ উল্টাইয়া যাইবে, তখন বিদ্যুৎ সদৃশ দীপ কলিকার জ্যোতিঃ দেখিতে পাইবেন। চক্ষুর তারা উল্টাইতে প্রথমে কিছু অন্ধকার দৃষ্ট হইবে ; কিন্তু তাহাতে বিচলিত না হইয়া স্থির ভাবে থাকিলে কিছুক্ষণ পরেই ঐরূপ জ্যোতি দেখিতে পাইবেন।

মোট কথা সাধন প্রণালী অন্য কিছুই নহে। কেবল চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারিলেই সিদ্ধ হওয়া যায়। চিত্তবৃত্তিকে যত্ন সহকারে ও অভ্যাসের দ্বারা যদি ইন্দ্রিয় পথে বহির্গত ও ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইতে না দেওয়া যায় এবং তাহাদিগকে ক্রম সঙ্কোচ প্রণালীতে একত্রিত করিয়া

পুঞ্জীকৃত বা কেন্দ্রীকৃত করা যায়, তখন যে কোন ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিলে, তাহা ধ্যেয়াকারে পরিণত হয়।

পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্যোতিঃ দর্শন প্রণালীর যে কোন ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া কৃতকার্য্য হইলে যখন ভ্রূর মাঝারে জ্যোতি-শিখা দেখিতে পাইবেন, তখন গুরূপদিষ্ট ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি চিন্তা করিতে করিতে আত্মা, ধ্যেয়ানুরূপ মূর্ত্তিতে জ্যোতিঃ মধ্যে প্রকাশিত হইবে। এইরূপে কালী. দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, গণেশ শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, ও শিবদুর্গা, প্রভৃতি যে কোন মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করিবেন, ঐরূপ প্রণালীতে ক্রিয়া করিলে ঐ সকল রূপ জ্যোতি মধ্যে দর্শন পাইবেন। জলমধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্বের দিকে দৃষ্টি সাধন করিয়াও ঐরূপ আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করা যায়। সুর্য্যমণ্ডল মধ্যেও ইষ্টদেব কিম্বা অপর দেব দেবী দর্শন করা যায়। কিন্তু ঐরূপ চেষ্টা করিরা অনেককে কাণা হইতে দেখিয়াছি। সুতরাং ঐরূপ ক্রিয়া করা কর্ত্তব্য নহে।

তত্ত্ব-সাধন।

পঞ্চতত্ত্ব হইতেই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং এই তত্ত্বেই তাহা লয় প্রাপ্ত হইবে। পঞ্চতত্ত্বের পর যে পরমতত্ত্ব, তিনিই তত্ত্বাতীত নিরঞ্জন। মানব শরীর ঐ পঞ্চতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মৃত্তিকা হইতে অস্থি, মাংস, নখ, ত্বক ও লোম এই পাঁচটী উৎপন্ন হইয়াছে। জল হইতে শুক্র,

শোণিত, মজ্জা, মল ও মূত্র এই পাঁচটী; বায়ু হইতে ধারণ, চালন, ক্ষেপণ, সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পাঁচটী; অগ্নি হইতে নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ক্লান্তি ও আলস্য এই পাঁচটী, এবং আকাশ হইতে কাম্ ক্রোধ, লোভ মোহ ও লজ্জা এই পাঁচটী উৎপন্ন হইয়াছে।

এই পঞ্চ তত্ত্বময় দেহে পঞ্চতত্ত্ব সূক্ষ্মরূপে বিরাজিত রহিয়াছে। যোগীগণ এ সমস্ত তত্ত্ব অবগত অছেন। মূলাধার চক্রটী পৃথিবী তত্ত্বের স্থান; লিঙ্গ মূলে স্বাধিষ্ঠান চক্রটি জলতত্ত্বের স্থান, নাভিমুলে মণিপুর চক্রটী অগ্নি তত্ত্বের স্থান; হৃদয়ে অনাহত চক্রটী বায়ুতত্ত্বের স্থান; এবং কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ চক্রটী আকাশ তত্ত্বের স্থান।

হস্তদ্বয়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি যুগল দ্বারা দুই কর্ণকুহর, তর্জ্জণী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা চক্ষু যুগল, মধ্যমাঙ্গুলি দ্বয় দ্বারা দুই নাসারন্ধ্র, অনামিকা অঙ্গুলিদ্বয় এবং কনিষ্ঠা অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা মুখবিবর, বন্ধ করিলে, যদি পীতবর্ণ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে পৃথিবীতত্ত্বের শুক্লবর্ণ দৃষ্ট হইলে জলতত্ত্বের, লালবর্ণ দৃষ্ট হইলে অগ্নিতত্ত্বের, শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইলে বায়ুতত্ত্বের, এবং বিন্দু বিন্দু নানা বর্ণ দৃষ্ট হইলে আকাশ তত্ত্বের উদয় জানিবেন।

"লং" বীজ পৃথিবীতত্ত্বের ধ্যান মন্ত্র। "বং" বীজ জল-তত্ত্বের ধ্যান মন্ত্র। "রং" বীজ অগ্নি তত্ত্বের ধ্যানমন্ত্র। "যং" বীজ বায়ুতত্ত্বের ধ্যান মন্ত্র। এবং "হং" বীজ আকাশ তত্ত্বের ধ্যান মন্ত্র।

তত্ত্বলক্ষণ জানিবার একটী সহজ উপায় এই যথা—সম্মুখে একখানি দর্পণ রাখিয়া তাহাতে শ্বাস পরিত্যাগ করিলে যে বাষ্প নির্গত হয়, তাহার আকার চতুষ্কোণ হইলে পৃথিবী-তত্ত্বের, অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় হইলে জলতত্ত্বের, ত্রিকোণ হইলে অগ্নিতত্ত্বের, গোলাকার হইলে বায়ুতত্ত্বের, এবং বিন্দু বিন্দুর ন্যায় দৃষ্ট হইলে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে জানিবেন। সূর্য্যোদয়ের সময় হইতে যথাক্রমে এক এক ঘণ্টা অন্তর এক এক নাসাপুটে প্রাণবায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে। বাম বা দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস বহন কালে যথাক্রমে এই পঞ্চ তত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। তত্ত্ববিৎ যোগিগণ তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া থাকেন।

জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতিনিয়ত শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য হইয়া থাকে। এই নিশ্বাস আবার দুই নাসিকায় এক সময়ে সমভাবে প্রবাহিত হয় না। কখন বাম, এবং কখন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হইয়া থাকে। কচিৎ, কখন এক আধ মুহূর্ত্ত দুই নাসিকায় সমভাবে শ্বাস প্রবাহিত হয়। বাম নাসাপুটের শ্বাসকে "ঈড়ার" বহন, দক্ষিণ নাসিকার শ্বাসকে "পিঙ্গলা"র বহন, এবং উভয় নাসাপুটে শ্বাস সমান ভাবে বহিলে তাহাকে "সুষুম্না"র বহন বলে। এক নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া অন্য নাসিকা দ্বারা শ্বাস রেচন কালে বুঝিতে পারা যায়, যে এক নাসিকা হইতে যেন শ্বাস প্রবাহ সরল ভাবে বহিতেছে এবং অন্য নাসিকা যেন বন্ধ, অর্থাৎ অন্য নাসিকা হইতে নিশ্বাস

যেন সরল ভাবে বাহির হইতেছে না। যে নাসিকা দ্বারা সরল ভাবে নিশ্বাস বাহির হইবে, তখন সেই নাসিকার শ্বাস ধরিতে হইবে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয়ের সময় আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস বহন হয়। এইরূপে দিবারাত্র মধ্যে দ্বাদশ বার বাম ও দ্বাদশ বার দক্ষিণ নাসিকায় ক্রমান্বয়ে শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। কোন্ দিন কোন্ নাসিকায় প্রথমে শ্বাসের ক্রিয়া হইবে, তাহার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে। যথা

আদৌ চন্দ্রঃ সিতে পক্ষে ভাস্করস্তু সিতেতরে।
প্রতিপত্তো দিনান্যাহঃ ত্রীণি-ত্রীণি ক্রমোদয়ে॥

পবন বিজয় স্বরোদয়।

অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া চন্দ্র নাড়ী অর্থাৎ বাম নাসায় এবং কৃষ্ণ পক্ষের প্রতিপদ তিথি হইতে তিন তিন দিন ধরিয়া সূর্য্যনাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ নাসায় প্রথমে শ্বাস প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া, সপ্তমী,অষ্টমী ও নবমী,এবং ত্রয়োদশী,চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা এই নয় দিনের প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় সময় প্রথমে বাম নাসিকায় এবং চতুর্থী, পঞ্চমী, ও ষষ্ঠী, এবং দশমী একাদশী ও দ্বাদশীতে এই ছয় দিনের প্রাতঃকালে প্রথমে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া আড়াই দণ্ড থাকিবে। পরে বিপরীত নাসিকায় উদয় হইবে। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া, সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, ত্রয়োদশী, চতুদর্শী ও অমাবস্যা

এই নয় দিন সূর্য্যোদয় সময়ে প্রথমে দক্ষিণ নাসায় এবং চতুর্থী পঞ্চমী ও ষষ্ঠী এবং দশমী একাদশী ও দ্বাদশী এই ছয় দিনের প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় সময়ে প্রথমে বাম নাসায় শ্বাস বহন আরম্ভ হইবার আড়াই দণ্ডান্তরে অন্য নাসায় উদয় হইবে। এইরূপ নিয়মে আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইয়া থাকে। ইহাই মনুষ্য জীবনে শ্বাস বহনের স্বাভাবিক নিয়ম। প্রতি দিন দিবা রাত্র ষাট দণ্ডের মধ্যে প্রতি আড়াই দণ্ড করিয়া এক এক নাসায় নির্দ্দিষ্ট মতে ক্রমান্বয়ে শ্বাস বহন কালে ক্রমশঃ পঞ্চতত্ত্বের উদয় হইয়া থাকে। এই শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বুঝিয়া কার্য্য করিলে শরীর সুস্থ থাকে, ও দীর্ঘজীবী হওয়া যায়॥

যখন বাম নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন স্থির কর্ম্ম সকল করা কর্ত্তব্য। সেই সময়ে যাত্রা, দান, বিবাহ, নববস্ত্র পরিধান, শান্তি কর্ম্ম, ঔষধ সেবন, রসায়ন কার্য্য, প্রভু-দর্শন, বন্ধু সংস্থাপন, বাণিজ্য ধন সংগ্রহ, নূতন গৃহ প্রবেশ, কৃষিকর্ম্ম, এবং বহির্গমন প্রভৃতি শুভকার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। কিন্তু বায়ু, অগ্নি ও আকাশতত্ত্বের উদয় সময়ে উক্ত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতে নাই।

যখন দক্ষিণ নাসাপুটে শ্বাস প্রবাহিত হইবে তখন ক্রুর এবং কঠিন কর্ম্ম অর্থাৎ নৌকাদি আরোহণ, শাস্ত্রাভ্যাস, মৃগয়া, গীতাভ্যাস, দুর্গ ও গিরি আরোহণ প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন।

উভয় নাসিকায় নিঃশ্বাস বহন কালে কোন প্রকার শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন না।

উদ্দালক উপাখ্যান।

এক্ষণে কি রূপ-সাধন প্রণালীতে মহামুনি উদ্দালক ভূত পঞ্চককে বিশীর্ণ করিয়া বিচার পরায়ণ হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছিলেন পাঠকগণের বিদিতার্থে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। অন্যান্য বৃত্তি অবরোধ করিয়া মনকে নিত্যানিত্য বিবেক প্রভৃতি বিচার-প্রবৃত্ত করিতে পারিলেই শীঘ্র সমাধি সমুৎপন্ন ও ব্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। দেহের স্পন্দন, তাহা অধ্যাত্ম বায়ুর শক্তি, এবং দেহে যে বোধের অধিষ্ঠান আছে, তাহা মহাচিতের অর্থাৎ পরমাত্মার প্রভাব। তদ্ভিন্ন জরা, মরণ প্রভৃতি দেহেরই ধর্ম্ম, পরন্তু অহং কোন কিছুতে নাই। বাসনাই বন্ধনের কারণ। ঐ বাসনা বাস্তবী নহে, উহাও কল্পনা দ্বারা সম্পাদিত। তাদৃশী বাসনাই ব্যামোহের ও বিনাশের কারণ।

বুদ্ধিযোগে উদ্দালক ঐ প্রকার বিচার করিয়া বদ্ধ-পদ্মাসনে ও অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে উপবেশন করিলেন। ওঁ এই অক্ষরটী পরব্রহ্মের প্রধান নাম ও অন্তরঙ্গ প্রতীক (পরব্রহ্ম উপাসনার প্রধান আলম্বন)। যে উপাসক উহা জানে ও জানিয়া ওঁ উচ্চারণ করে, সে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। মুনি উদ্দালক ঐ রহস্য বিদিত হইয়া তারস্বরে ও যথাযথ নিয়মে ওঁ শব্দের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সে ধ্বনি অর্থাৎ সেই ওঁকার ধ্বনি ঊর্দ্ধগামী ও ঘণ্টা-নিনাদ তুল্য হইল। উদ্দালক তাবৎকাল

ওঁকার উচ্চারণ করিয়াছিলেন, যাবৎ না তাঁহার তাদৃশ প্রকারে উচ্চারিতপ্রণব ধ্বনি মূলাধার হইতে উত্থিত ও ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অর্থাৎ ব্রহ্মতত্ত্বে সমাধি না হওয়া পর্য্যন্ত ওঁ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ওঁ এই অক্ষর সার্দ্ধ ত্রি অবয়বযুক্ত (অ, উ, ম, ৺) তন্মধ্যে প্রথম অবয়ব অ, তাহার উচ্চারণ উদাত্ত-স্বরে অর্থাৎ অতি তীব্র বা তারস্বরে করিতে হয়। উদ্দালক প্রাণপণ যত্নে উক্ত প্রথমাংশের উচ্চারণ করিলে তাঁহার প্রাণবায়ু মূলাধার হইতে ওষ্ঠপুট পর্য্যন্ত প্রতিঘাত করিয়া বহির্গমন করিল। তাহাতে তাঁহার "রেচক" নামক যোগাংশ নিষ্পন্ন হইল। তাহাতে তদীয় প্রাণবায়ু তদ্দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিদাকাশ অবলম্বন করিল। তৎকালে তাঁহার অন্তজ্ঞান বিলুপ্ত, কেবল আত্মচেতনা অবশেষিত রহিল। পরে তিনি ভাবিলেন,প্রাণ বহির্গমন জনিত সংঘট্টে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া তাঁহার দেহকে ভস্মসাৎ করিয়াছে। প্রাণ বহির্গত, অগ্নিদ্বারা শরীর দাহ, এসকল ভাবনার দ্বারাই নিষ্পন্ন হইয়াছিল,হঠের দ্বারা নহে। হঠের দ্বারা প্রাণ বহির্গমন করিতে গেলে মরণ মূর্চ্ছাদি হয়। হঠযোগ বিশেষ কষ্টপ্রদ। এক্ষণে প্রণবের দ্বিতীয়াংশ (উ) উচ্চারণ কালের উদ্দালকের যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও কীর্ত্তন করি।

প্রণবের দ্বিতীয়াংশ উ, উচ্চারণ অনুদাত্ত অর্থাৎ মন্দ বা গম্ভীর। সুতরাং মন্ত্র ধ্বনিকালে তাঁহার প্রাণায়ামের "কুম্ভক" নামক যোগাংশ নিষ্পন্ন হইয়াছিল। অর্থাৎ প্রাণবায়ু স্তম্ভিত হইয়া সমস্থিতিতে রহিল।

পরে প্রণবের তৃতীয়াংশ (ম) উচ্চায়ণ কালে ওষ্ঠ পুটাদির সংবৃতি ও বায়ুর স্তম্ভিতত্ব প্রভৃতি কারণে তাঁহার "পূরক" নামক প্রাণায়ামের যোগাংশ সুসম্পন্ন হইল। তাদৃশ পূরক যোগকালে তাঁহার প্রাণবায়ু চিদমৃতের মধ্যগত হওয়ায় চন্দ্রমণ্ডলাকারে পরিণত হইল। উদ্দালকের প্রাণবায়ু অমৃতময় চন্দ্র মণ্ডলতা প্রাপ্ত হইয়া অমৃত ধারা বর্ষণ করিলে তাঁহার সেই ভস্মীভূত দেহ চতুর্ব্বাহু সমন্বিত বিষ্ণুদেহের ন্যায় দেহে পরিণত হইল। তদবসরে তদীয় প্রাণাদি বায়ুগণ সেই আবির্ভূত দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ কুণ্ডলিনী স্থান প্রভৃতি পরিপূরিত ও তদ্দেহকে প্রকৃতিস্থ করিল। তৎপরে তিনি অভিনব ভাবনা সম্পাদ্য বৈষ্ণব দেহ লাভ করিয়া সমাধি সাধনের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। ইহাই অর্দ্ধমাত্রায় স্থিতি।

অনন্তর পদ্মাসনোপবিষ্ট উদ্দালক সেই ভাবময় দেহে অবস্থান করতঃ ইন্দ্রিয়দিগকে নিরুদ্ধ করিলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধির নিমিত্ত অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ উদ্দালক প্রণব জপ প্রসঙ্গে প্রাণায়াম যোগ ও তদ্দ্বারা ভূতশুদ্ধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া শুদ্ধ দেহ হইলেন,এবং সমাধি-সাধনের অধিকারী বা যোগ্য পাত্র হইলেন। অতঃপর তিনি নিজ অভীপ্সিত সমাধির অনুষ্ঠান করিলেন। এইরূপ ভাবনাময় দেহে সমুদয় দেবতার উপাসনা বা পূজা করার বিধান আছে এবং এতদনুযায়ী প্রথাও এতদ্দেশের উপাসক ও পূজক সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্ট হয়।

হে বিশ্বভৃৎ! যাঁহারা তোমাকে এক বলিয়া উপদেশ করেন, সেই সকল গুরুদিগকে নমস্কার।

পরিশিষ্ট

১। পাঠকগণের বোধ সৌকর্য্যার্থের বশিষ্ঠদেব শ্রীশ্রীরাম-চন্দ্রকে যোগ সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। রামচন্দ্র বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! প্রাণ নিরোধ দ্বারা বাসনা বিনাশ ও তাহা হইতে জীবন্মুক্ত পদলাভ যে প্রক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই প্রক্রিয়া আমার নিকট বর্ণন করুন।

২। বশিষ্ঠ বলিলেন, সংসার উত্তরণের যে যুক্তি (শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া), তাহাকে আমরা যোগ শব্দে উল্লেখ করি। সেই যোগ দুই প্রকার। উভয় প্রকারেরই ধর্ম্ম, চিত্তের উপশম। তাহার অন্য এক প্রকার আত্মজ্ঞান, পৃথিবীতে তাহা সর্ব্ববিদিত। দ্বিতীয় প্রকারের নাম প্রাণ নিরোধ, এক্ষণে তাহার বিবরণ বলি, শ্রবণ কর। রামচন্দ্র বলিলেন উক্ত দুই প্রকারের মধ্যে যে প্রকার সুলভ, শুভ ও অল্প কষ্টকর, তাহা আমাকে বলুন। তাহা বিদিত হইলে আমার আর চিত্ত বিক্ষেপের ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না।

বশিষ্ঠ বলিলেন, যদিও তত্ত্বজ্ঞান ও প্রাণ নিরোধ এই উভয় প্রকারই যোগ শব্দের বাচ্য; তথাপি প্রাণ নিরোধ বিষয়েই যোগ শব্দের প্রসিদ্ধি অতিশয় বিস্তৃত হইতে দেখা যায়। সংসার উত্তরণের ক্রম দ্বিবিধ। একযোগ ও অপর জ্ঞান। মনীষিগণ বলেন যে, ঐ দুই উপায়ের ফল একই প্রকার। অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারাও সংসার জয় হয় এবং যোগের দ্বারাও সংসার জয় হয়। তন্মধ্যে অধিকারী ভেদে উক্ত উভয়ের

সাধ্যাসাধ্য বিভাগ স্থিরীকৃত আছে। অর্থাৎ কাহার কাহার পক্ষে যোগ অসাধ্য এবং কাহার কাহার পক্ষে জ্ঞান ও অসাধ্য। পরন্তু আমি মনে করি, জ্ঞানই সুসাধ্য। তৎপ্রতি কারণ এই যে জ্ঞান সকল অবস্থায় সদা স্বপ্রকাশ। আর অজ্ঞান পর প্রকাশ্য অর্থাৎ সাক্ষী চৈতন্যের প্রকাশ্য। পরাধীন বিষয়ে অজ্ঞান ও তদ্ ঘটিত কৌশলের কার্য্য দুষ্কর এবং স্বপ্রকাশ বিষয়ে জ্ঞান রূপ উপায় অদুঃখ প্রদ। যোগে ধারণা, আসন ও উপযুক্ত স্থানাদি আবশ্যক হয়, সেজন্য তাহা সুসাধ্য হয় না। কিম্বা চিত্ত স্থির করিয়া ধ্যানাদি করা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অতি দুষ্কর হইয়া থাকে। হে রঘুনাথ! শাস্ত্রে যে জ্ঞান ও যোগ এই দ্বিবিধ উপায়ই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার একতর জ্ঞান। এই জ্ঞান অত্যন্ত নির্ম্মল, অর্থাৎ জ্ঞেয় দ্বারা অবিদ্ধ।

এক্ষণে যোগের কথা বলি, শ্রবণ কর। এই যোগ প্রাণ ও অপান নামক দ্বিবিধ অধ্যাত্ম বায়ুর সমতা বা নিরোধ এতন্নামে প্রসিদ্ধ। ইহা সিদ্ধি কামুকের সিদ্ধিদাতা এবং জ্ঞান কামীর মোক্ষ দাতা (যাঁহারা অনিমাদি সিদ্ধি ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের অনিমাদি সিদ্ধি হয়, এবং যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান কামনা করেন, তাঁহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয়। হে রাজকুমার রাম! তুমি যদি প্রাণ সঞ্চরণ রোধকরতঃ সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইতে পার, তাহা হইলে তুমি সেই বাক্য মনের অবর্ণনীয় পরমানন্দ অনুভবের লাভ করিতে পারিবে। সম্পূর্ণোহয়ং গ্রন্থঃ।

ওঁ তৎ সৎ॥ ওঁ হরি ওঁ

শ্রীশ্রীহরি
শরণম্

বৰ্দ্ধমান
২-৩-৩৮

শ্রীচরণেষু—

প্রণাম নিবেদন বিশেষ—

আপনি আমাপেক্ষা কিছু বয়োঃধিক এবং সাধনমার্গে অনেক উন্নত, আপনার গ্রন্থ ষষ্ঠেন্দ্রিয় খানি পড়িয়া বুঝিলাম আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন যাহাতে অচিরে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হই। আমার স্বপ্নলব্ধ বৈদিক গুরু এক বৎসর কাল আমাকে কাছে রাখিয়া যাহা শিক্ষা দিয়াছেন আপনার গ্রন্থে তাহাই আছে দেখিয়া সুখী হইলাম। "গীতাতে যোগভ্যাসের যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাই অবলম্বনকরা বিধেয়। তান্ত্রিক ষট্ চক্রভেদাদি যাহা লিখিয়াছেন সকলই সত্য। কিন্তু সে সাধনা যিনি সেরূপ গুরু পাইয়াছেন তাঁহার পার্শ্বে ভিন্ন সাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর বলিয়া কয়েক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি। ষষ্ঠেন্দ্রিয় শরীর অবলম্বন করিয়া আছে, পাত্রানুসারে গুরূপদেশ মত সাধন করিলে রোগ মুক্তি ও বিভূতি প্রাপ্তি সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করি। কিন্তু প্রধান সহায় গুরুকৃপা। আপনার গ্রন্থ আমার অনেক উপকারে আসিয়াছে। আমি আপনার দর্শন পাইবার জন্য শীঘ্র একবার চেষ্টা করিব। আমার শরীর বহুদিন রোগগ্রস্ত কিন্তু গুরুর কৃপায় নিত্যকর্ম্ম বলে এখনও জীবিত আছি।

শ্রীবরদা প্রসাদ দেবশর্ম্মা
রিটায়র্ড ডিষ্ট্রীক্ট জজ

নলতা হাই স্কুল

নলতা পোষ্ট
খুলনা জেলা
১৯-১১-৩২

সবিনয় নমস্কারান্তে নিবেদনম্—

মহাশয়! আপনার প্রণীত ষষ্ঠেন্দ্রিয় পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি। কয়েকটি আধ্যাত্মিক এবং পারলৌকিক বিষয় মীমাংসার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমি বিশেষ ইচ্ছুক হইয়াছি! বর্ত্তমানে কলিকাতায় গেলে আপনার সহিত দেখা হইতে পারে কিনা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। আপনার উত্তর পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রী
হেড্ পণ্ডিত,
নলতা হাই স্কুল।

Nalta H. E. School

22. 3. 31.

সশ্রদ্ধ নমস্কারান্তে নিবেদনম্—

আপনার অনুগ্রহ লিপি এবং আমার পুস্তক সম্বন্ধে আপনার অভিমত প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করিবেন।

আপনার "ষষ্ঠেন্দ্রিয়" পড়িতেছি। আমাদের হতভাগ্য দেশ এখনও যে বিদ্যার গৌরবে পাশ্চাত্যকে স্তম্ভিত করিতে পারে, আপনি সেই বিদ্যার অনুশীলন ও প্রচার দ্বারা সত্যই আমাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। মনোবিজ্ঞান এবং যোগ দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি, এবং অনুশীলনের প্রকার পদ্ধতিগুলি এমন সরল ভাবে আপনি বিবৃত করিয়াছেন যে মনোযোগী ছাত্র বা পাঠক মাত্রেই উহা বুঝিতে পারিবেন। ভারতের বৈশিষ্ট্য রক্ষায় আপনি যে সহায়তা করিতেছেন, এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে যেরূপ পরিষ্কারভাবে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের তত্ত্ব, অভিব্যক্তি, পরিণতি প্রভৃতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাতে আপনি আমাদের নমস্য। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি চিরজীবী হইয়া দেশকে বিদ্যা ও জ্ঞানদান করুন।

নিঃ—শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
হেড মাষ্টার।